দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

তদন্তের জেরা এড়িয়ে
কোথায় পালাতে চাইছে
অভিষেক —পৃ : ২৩

শিক্ষক নিয়োগের মানদণ্ডে
বিএড কি আদৌ প্রয়োজন ?
—পৃ : ১১

৭৫ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা।। ৫ জুন, ২০২৩।। ২১ জ্যৈষ্ঠ - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

৫ জুন - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে'

☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

ঘিদিরঘসা উলটে দিলে পালটায় না ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

নবনির্মিত সংসদ ভবনের উদ্বোধন বয়কট বিরোধীদের আত্মঘাতী গোল ☐ শীলা ভাট ☐ ৮

মোদী সরকারের নয় বছর ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

শিক্ষক নিয়োগের মানদণ্ডে বিএড কি আদৌ প্রয়োজন?

☐ সুদীপ্ত গুহ ☐ ১১

অধিকারী থিসিস এবং ভারতের কমিউনিস্টদের দ্বিচারিতা

☐ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ☐ ১৩

দেশভাগের শোকে সাভারকর মাতৃবিয়োগের মতো কেঁদেছিলেন

☐ প্রদীপ মারিক ☐ ১৭

তদন্তের জেরা এড়িয়ে কোথায় পালাতে চাইছেন অভিষেক

☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ২৩

সেঙ্গল উজ্জ্বল ভারতের প্রতীক ☐ সরোজ চক্রবর্তী ☐ ২৬

বারুদের স্তূপের ওপর পশ্চিমবঙ্গ ☐ তরুণ কুমার পণ্ডিত ☐ ২৮

কর্মফলেই মানুষ পায় আনন্দ ও যন্ত্রণা ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি মাসান ঠাকুর

☐ সুস্মিত চক্রবর্তী ☐ ৩৪

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের এক মহান যুদ্ধ এবং ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা

☐ মলয় দাস ☐ ৩৫

তদন্তে কীসের এতো ভয়? কী লুকোতে চাইছেন?

☐ বিমল শঙ্কর নন্দ ☐ ৪৩

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি এবং বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

☐ ড. সুমন চন্দ্র দাস ☐ ৪৩

'দ্য কেরালা স্টোরি' শুধু কেরালার নয়, সারা বিশ্বের গল্প

☐ সুবল সরদার ☐ ৪৭

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ৩০ ☐ খেলা : ৩৮ ☐ অন্যরকম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯ ☐ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ১২ জুন, ২০২৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১২ জুন, ২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গে জলসংকট

জলের আর এক নাম জীবন। সেই জীবনেরই সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গে। জলসঙ্কট সারা দেশেই বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে এর ছবিটা একটু অন্যরকম। বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়ায় সারা বছরই পানীয় জলের সংকট তীব্র মাত্রা নেয়। আবার উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে ভূগর্ভস্থ জলে মিশে থাকে আর্সেনিকের মতো প্রাণঘাতী বিষ। এই অবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কী ভাবছে, মানুষকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করার জন্য কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, তাই নিয়েই স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা। লিখবেন হীরক কর, অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরভ সিংহ প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নির্দোষ হইলে ভয় কেন?

পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটি বর্তমান শাসকদলের আমলে এক আজব রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। এই রাজ্যের শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা চোর অভিধায় ভূষিত হইয়াছেন। তাহাদের দেখিলেই সর্বত্র চোর চোর ধ্বনি উঠিতেছে। রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব হইতে শিক্ষা বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা চুরির দায়ে জেলে রহিয়াছেন। নিয়োগ দুর্নীতির সন্ধান করিতে যাইয়া তদন্ত সংস্থাগুলির চক্ষু চড়কগাছ হইয়াছে। সর্বত্রই শুধু চুরি। শাসকদলটির পরতে পরতে চুরির সন্ধান মিলিতেছে। সমস্ত দেখিয়া মনে হইতেছে, ইহারা ক্ষমতায় আসিয়াছে দুর্নীতি ও চুরি করিয়া পকেট ভরাইবার জন্য। আমফানে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ চুরি হইতে শুরু করিয়া একশত দিনের কাজের কাটমানি, আবাস যোজনার কাটমানি, চাকুরি চুরি, বালি চুরি, কয়লা চুরি, গোরুপাচার ইত্যাদি হাজারো চুরির সন্ধান পাইয়াছেন তদন্ত সংস্থার আধিকারিকরা। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে দুর্নীতি ও অবৈধ কাজকর্মকে শাসকদলের নেতা-কর্মী ও মন্ত্রীরা জীবনের অঙ্গ করিয়া লইয়াছেন। শাসকদলের একজন পঞ্চায়েত সদস্য হইতে নেতা-মন্ত্রীর এমন একজনকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যাহারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নহেন। তাই আজ কোথাও কোথাও নেতাদের নামে নামে চোর বলিয়া পোস্টার পড়িতেছে। সবচাইতে আশ্চর্যের হইল, ইহাতে শাসকদলের কাহারও মধ্যে ন্যূনতম লজ্জাবোধ পরিলক্ষিত হইতেছে না। এক বর্ষীয়ান নেতা গর্বভরে বলিয়াছেন, সকল দলের মধ্যেই চোর রহিয়াছে। দলের সর্বোচ্চ নেত্রী এক দলীয় সমাবেশে বলিয়াছেন, মানুষ চোর বলিলে তাহা গায়ে মাখিবার প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ তিনি খুব ভালোবাবেই জানেন চোরেদের লইয়াই তাঁহার দল এবং সরকার চলিতেছে। শাসকদলের একজন বিধায়ক প্রকাশ্যেই স্বীকার করিয়াছেন তাহাদের দলটি চোরেদের দলে পরিণত হইয়াছে। ভাবিবার বিষয় হইল, সর্বোচ্চ নেত্রীর অনুপ্রেরণা ব্যতীত যে দলে চোখের পলক ফেলিবার কাহারও সাধ্য নাই, সেই দলের সামান্য পঞ্চায়েত কর্মী হইতে নেতা-মন্ত্রীরা চুরি করিতেছে কীভাবে?

সৌভাগ্যের বিষয় হইল, এই রাজ্যের মানুষ শাসকদলের রক্তচক্ষুর ভয়ে চুপ অথবা উদাসীন থাকিলেও রাজ্যের বিচারব্যবস্থা সক্রিয় রহিয়াছে। বিচার ব্যবস্থার সামনে পড়িয়া শাসকদলের ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছে। চুরির টাকা কোথায় এবং কাহার হাতে যাইতেছে তাহার হদিস পাইতে বিচারব্যবস্থার এখন দলের যুবরাজের প্রতি নজর পড়িয়াছে। তদন্ত সংস্থা তাঁহাকে দীর্ঘ জেরা করিয়াছে। সমস্ত দুর্নীতির মাথাটি যে যুবরাজই আর তাঁহকে জেরা করিলেই সমস্ত কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িবে তাহা বুঝিতে পারিয়াই দলের সর্বোচ্চনেত্রী হম্বিতম্বিও শুরু করিয়াছেন। অপরাধীকে আড়াল করিবার প্রমাণ তিনি বহুবার রাখিয়াছেন। বিপদ বুঝিতে পারিয়া তাঁহার দলের যুবরাজ পুনরায় জেরা এড়াইবার জন্য সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ পর্যন্ত হইতেছেন। প্রশ্ন উঠিয়াছে, তিনি যদি নির্দোষ হন তাহা হইলে তদন্তের মুখোমুখি হইতে ভয় পাইতেছেন কেন? অর্থাৎ তাঁহার বুঝিতে আর বাকি নাই যে তাঁহার পাপের ঘড়া পূর্ণ হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গেই কংগ্রেস দলের ভূমিকাটি বড়োই বিস্ময়কর। তাহাদের রাজ্যনেতা শাসকদলের সমস্ত চুরির তদন্ত ও শাস্তি চাহিতেছেন, কিন্তু তাহাদেরই দলের এক একজন আইনজীবী নেতা সেই চোরেদের বাঁচাইবার জন্য আদালতে সওয়াল করিতেছেন। দেশের মানুষ অবশ্য জানে যে কংগ্রেসের চরিত্রটি বরাবরই বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ। তাই শতাব্দীপ্রাচীন দলটির আজ করুণ অবস্থা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসীর ভাবিবার সময় আসিয়াছে, তাহারা কি চোরেদের শাসনাধীনে থাকিতে পছন্দ করেন? বিচার প্রক্রিয়া যেইভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে নিশ্চিত যে চোরেদের কারান্তরালেই স্থান হইবে। কিন্তু রাজ্যবাসী সচেতন না হইলে পুনরায় তাহাদের সেই চোরেদেরই শাসনাধীনে থাকিতে হইবে।

সুভাষিতম্

কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।

ব্যসনেন চ মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন বা।।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করে আনন্দে সময় অতিবাহিত করেন। আর মূর্খেরা বিলাসব্যসন, নিদ্রা ও কলহ করে সময় কাটিয়ে দেয়।

‘অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

অন্যায় করাটাই এখন পশ্চিমবঙ্গের আইন। তাই অন্যায় করেও এ রাজ্যের কিছু বাছাই অপরাধী গলা ফুলিয়ে আস্ফালন করছে। একসময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সব অপরাধীদের প্রকাশ্যে মদত দিতেন। তাদের সমর্থনে বহু ধরনের আজগুবি প্রশ্ন তুলতেন। ভাবটা ছিল তারা যদি চোর হয়, তিনিও তাহলে সমান অপরাধী। খানিকটা মাসতুতো ভাইয়ের সম্পর্ক। পাপের পাল্লা ভারী হয়ে ওঠায় মমতা এখন কায়দা পালটে ফেলেছেন। এখন পরোক্ষে মদত দেন। আর তাতেই তাদের অপরাধ মান্যতা পেয়ে যায়।পাপিষ্ঠা মাতাকে পরিত্যাগ আর বিষাক্ত হাত কেটে ফেলতে বলেছেন চাণক্য। রাজ্যের মানুষকে চোর ডাকাতের দল আর প্রশাসনকে ছেঁটে ফেলতে হবে। কোনো বিরোধী মুখ লাগবে না। জনরোষে দুরাচারী রাজা আর প্রশাসন খান খান হয়ে যাবে। জনরোষ থেকেই উঠে আসবে নতুন প্রশাসনের মুখ। জেদের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে মমতা-প্রশাসনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ছেন রাজ্যের মানুষ। তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রী দেখলেই স্লোগান উঠছে ‘চোর চোর’। কিছুদিন আগে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তা শুনতে হয়েছে। এখন পর্যন্ত ব্যতিক্রম মমতা। কারণ তিনি কাজ করেন ইঙ্গিতে।

মমতার প্রশাসনের নগর পুড়তে চলেছে। তাঁর কালীঘাটের বাড়ি তার থেকে রেহাই পাবে না। মমতা তা জানেন। তাই নিজের পরিবার দেখিয়ে আবেগপ্রবণ বাঙ্গালির মনে ‘ইউফেমিজম’ বা মনে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন যে তার পরিবারকে ইচ্ছা করে আঘাত করা হচ্ছে। প্লাস্টারের পা দেখিয়ে ২০২১-এর ভোট সাফল্যের সঙ্গে জিতেছিলেন মমতা। এখন পরিবারকে সামনে রেখে পঞ্চায়েত দখলের বাহানা টানছেন। রাজ্যের মানুষ সে ছড়া শুনবেন না। সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে অভিষেকবাবুকে সব ধরনের তদন্তের মুখোমুখি হতেই হবে।। কোনো রেহাই মিলবে না।

রক্ষাকবচ চেয়ে অভিষেকবাবু বারবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। এটা নাকি পুলিশ অফিসার রাজীব কুমারের কায়দা। আপাত দুরাচারী এই পুলিশ অফিসার সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচ না পেয়েও কলকাতা আদালত থেকে জামিনের পর জামিন নিয়ে পালিয়ে রয়েছেন। পিঠ বাঁচাতে মমতা তাঁকে পুলিশের কাজ থেকে সরিয়ে তথ্য ও কারিগরি দপ্তরের অফিসার বানিয়ে রেখেছেন। তিনি নাগালের বাইরে থাকায় সারদা চিটফান্ড মামলার তদন্ত আটকে রয়েছে। বিরোধীদের ধারণা, তদন্তে অভিষেকবাবু আটকে পড়লে দুর্নীতির সামগ্রিক পর্দা ফাঁস হয়ে যাবে। তদন্তকারীরা আদালতকে জানিয়ে দিয়েছে দুর্নীতির জাল রাজ্যের ১৭টি জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে। তবে

রাজ্যের মানুষ জানেন, এরাজ্যের প্রধান অপরাধীরা এখন দল কিংবা প্রশাসনের ওতপ্রোত অংশ। তাদের বাদ দিয়ে শাসক দল বা প্রশাসন চলতে পারে না।

এটা মনে রাখা দরকার, আদালতের নির্দেশে সিবিআই আর ইডি এরাজ্যে দুর্নীতির তদন্ত করতে এসেছে। অভিষেকবাবুকে ধরতে নয়। তদন্তে অভিষেক ধরা পড়তেই পারেন, কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করা তদন্তের উদ্দেশ্য নয়।

বিরোধীদের আক্রমণের ধাঁচটা আমার আপাত অবৈজানিক আর অযৌক্তিক বলেও মনে হয়েছে। তারা সর্বদা মমতা আর অভিষেককে টার্গেট করে চলেছেন, দুর্নীতি নয়। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী যথার্থ বলেছেন, ‘দুর্নীতির মাথা ধরা পড়বেই।’ বুদ্ধিমান রাজনীতিকের মতো কার মাথা বলেননি। রাজ্যের মানুষ তা জানেন। কলকাতা পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ছাড় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তৃণমূলের কয়েকজন ভারিক্কি বিধায়ক আর পুরপিতা তাতে আটকে পড়তে পারে। মমতা-পরিবারের এক পৌরমাতার বেআইনি সম্পত্তির বিরুদ্ধেও তদন্ত চলছে।

অভিষেকবাবুর বিরুদ্ধে একসঙ্গে ছটি মামলার তদন্ত চলছে। মজার ব্যাপার, এখন পর্যন্ত কোনো তদন্তেই তিনি অভিযুক্ত নন। তবে তদন্ত এড়িয়ে তিনি থাকতে পারবেন না। আমার ধারণা, তদন্তে এক প্রভাবশালী মন্ত্রী আর অভিষেক ঘনিষ্ঠ ‘কালীঘাটের কাকু’ বা সুজয় ভদ্র গ্রেপ্তার হবেন যদি না তিনি রাজসাক্ষী হয়ে যান। রাজ্যের মানুষ জানেন, এরাজ্যের প্রধান অপরাধীরা এখন দল কিংবা প্রশাসনের ওতপ্রোত অংশ। তাদের বাদ দিয়ে শাসক দল বা প্রশাসন চলতে পারে না। রাজ্যজুড়ে যেভাবে বোমা আর বেআইনি বাজি কারখানা উদ্ধার হচ্ছে সেটাই প্রমাণ। এই অন্যায় রাজ্যের মানুষ সহ্য করবেন না। অন্যায়কারীর অন্যায়কে সহ্য করা সমান অপরাধ। অন্যায়কে মেনে নিয়ে রাজ্যের মানুষ নিজেরা অপরাধী হতে চান না। তাঁরা অন্যায় আর অপরাধকে সরাতে চান। শুধু সময়ের অপেক্ষা। সেপ্টেম্বরেই সে যবনিকা টানা হয়ে যাবে। ■

ঘিদিরগসা উলটে দিলে পালটায় না

একেবারে উপরে যেটা লিখেছি সেটা আপনি সবার আগে বুঝেছেন আমি জানি। কিন্তু দিদি, উলটে দিলেই কি পালটে যায়?

মাত্র তো তিনটে মাস! কেউ কি আর ভুলে যায়? প্রায় ২৩ হাজার ভোটে সাগরদিঘিতে হেরেছিল আপনার দল তৃণমূল। যে উপনির্বাচনে একজোট হয়ে প্রার্থী দিয়েছিল বাম-কংগ্রেস। তৃণমূলের তরফে সেই ভোটে মূল দায়িত্বে ছিলেন আপনার প্রিয় ভাইপো। হেরেছিল কে? আপনার এক ভাই।

দলটা যে আপনার হাত থেকে চলে যাচ্ছে সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিল আপনার সেই ভাইয়ের বিরুদ্ধে আপনার অনুমতি ছাড়াই আপনার ভাইপোর পদক্ষেপ। এবার যে হারিয়েছিল তাকে দলে নিয়ে এসে আপনার পায়ের কাছে বসিয়ে দিল। আপনি নিশ্চয়ই খুশি! তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী আপনি। তিন মাস আগে প্রায় ২৩ হাজার ভোটে সাগরদিঘিতে হেরেছিল তৃণমূল। ভোটের দায়িত্ব ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী আপনি সাগরদিগিতে প্রচারে যাননি। কেনই-বা যাবেন? একটা উপনির্বাচনের জন্য আপনাকে ছুটতে হবে কেন? গিয়েছিলেন অভিষেক। ফলে ২০১১ সাল থেকে টানা ১০ বছর দখলে রাখা সাগরদিঘি হারার 'দায়' অনেকটাই এসে পড়ে অভিষেকের কাঁধে। গত ২৯ তারিখ সোমবার বাম-কংগ্রেসের মিলিত ভোটে জয়ী বাইরন বিশ্বাসকে তৃণমূলে এনে সেই ব্যর্থতা মুছলেন অভিষেক— এমনই বলছে আপনার দল। তবে একই সঙ্গে এমনও প্রশ্ন উঠছে যে, ভোট হলে কী হতো? বাইরন অবশ্য দাবি করেছেন, ভোট হলে তিনি আরও বড়ো ব্যবধানে জিতবেন। তাঁর কথায়, ' আবার ভোট হলে আবার জিতে প্রমাণ করব যে এটা কংগ্রেসের ভোটে জয় নয়।'

বাঃ, কী সুন্দর কথা। তবে তৃণমূলের কাছে এসব নতুন কিছু নয়। মুকুল দিয়ে শুরু, বাইরন দিয়ে শেষ। আবার এক বিজেপি বিধায়ককে তৃণমূল জেলা সভাপতি বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু বিধানসভার স্পিকার বলেন, ওঁরা কেউ তৃণমূলের নয়, সবাই বিজেপির। তা না হলে তো আবার আইনি চাপ রয়েছে। এ বড়ো রঙ্গ! সত্যিই যা দেখে অভিভূত বঙ্গ।

সাগরদিঘির ফলাফলে রাজ্য রাজনীতিতে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল। প্রথমত, সংখ্যালঘু ভোট কি তৃণমূলের থেকে সরে গিয়ে বাম-কংগ্রেসে যাচ্ছে? দ্বিতীয়ত, তৃণমূলের বিরুদ্ধে কি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা কাজ করছে?

আচ্ছা, বাইরন তৃণমূলে চলে আসায় কি সেই বিরোধিতা ধুয়ে গেল? না কি রয়ে গেল? সংখ্যালঘুরা কি বিশ্বাস পদবিধারীর অবিশ্বাসের কাজকে মেনে নেবেন?

দিদি, একটু পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটছি। বেশি পুরনো নয়, মাস তিনেক আগের কথা।

স্বার্থের জন্য বিশ্বাসভঙ্গ করতে আপনি দ্বিতীয়বার ভাবেন না। তাই বিশ্বাসকে দলে টেনেও আপনার দলের প্রতি, আপনার প্রতি বিশ্বাস টানতে পারবেন কি?

১৯৭৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত টানা বামেদের দখলে ছিল মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি বিধানসভা। ২০১১ সালে 'পরিবর্তনের ভোট'-এ সাগরদিঘি জেতে তৃণমূল। সেই থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সাগরদিঘির দখল ছিল তৃণমূলেরই হাতে। কিন্তু গত বছরের ডিসেম্বরে রাজ্যের খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা সাগরদিঘির বিধায়ক সুব্রত সাহার মৃত্যুর পর বিধায়কশূন্য হয়ে পড়ে ওই কেন্দ্র। ২৭ ফেব্রুয়ারি ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়। যেখানে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি প্রার্থী করে তৃণমূল ছেড়ে আসা দিলীপ সাহাকে। যিনি ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে সাগরদিঘিতে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। বাম-কংগ্রের জোটের প্রার্থী হন বাইরন। তিনি জেতেন প্রায় ২৩ হাজার ভোটে।

তারপরে দিদি আপনি এবং ভাইপো ওই হারের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তুলে আনেন 'রাম-বাম-হাত'-এর আঁতাতের কথা। আপনি তো সরাসরি বলেন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী তৃণমূলকে হারাতে বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করেছেন। যাতে বিজেপির ভোটও বাম-কংগ্রেস প্রার্থীর ঝুলিতে আসে। এবার তাহলে কী বলবেন?

এ বড়ো রঙ্গ দিদি, এ বড়োই রঙ্গ। তবে একটা কথা ঠিক দিদি। জাতীয় স্তরে আপনার স্বপ্নের জোট হবে কি না তার ঠিক নেই কিন্তু রাজ্যে আপনার জোট হয়ে গেল। দেখুন, এটা তো বলাই যাবে যে, বাম-কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের বিধায়কের নাম বাইরন বিশ্বাস।

খালি ওই পদবিটা লিখতে খচখচ করছে। অনেকে বলে, আমি মোটেও নয়, যে আপনাকে দেশের কোনো রাজনৈতিক দল বিশ্বাস করে না। কেউ না। কারণ, সবাই জানে স্বার্থের জন্য বিশ্বাসভঙ্গ করতে আপনি দ্বিতীয়বার ভাবেন না। তাই বিশ্বাসকে দলে টেনেও আপনার দলের প্রতি, আপনার প্রতি বিশ্বাস টানতে পারবেন কি? একান্ত অনুরোধ, ভাই হিসেবে এই প্রশ্ন আমায় ভাবাচ্ছে দিদি। □

অতিথি কলম

শীলা ভাট

নব নির্মিত সংসদ ভবনের উদ্বোধন বয়কট বিরোধীদের আত্মঘাতী গোল

মমতা ব্যানার্জি, রাহুল গান্ধী, এম কে স্টালিন— এঁরা যৌথভাবে বিজেপি ও মোদীকে চিরকালের জন্য অবিস্মরণীয় এই মুহূর্তের স্রষ্টা করে দিয়ে ভারতের জাতীয়তাবোধের একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঋত্বিকও করে দিলেন।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে মোদী সরকারের বহু উদ্যোগকে বিরোধীরা বহুবিধ কারণে বা নিজস্ব যুক্তি সাজিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাজ্য করেছে। কোনো কোনো সময় তার মধ্যে যুক্তিগ্রাহ্যতা থেকে থাকতেও পারে। বিরোধীদের অতীত উদাহরণ দিয়েই বলা যায় যে, জাতীয় উদ্দেশে নিবেদিত নতুন সংসদ ভবনের প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা উদ্বোধন কোনো তথাকথিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএএ) নয় যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বাস্তবে এটি ছিল জাতির মিলনের মুহূর্ত যার মাধ্যমে আমরা আমাদের যৌথ সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে ইংরেজ নির্মিত এক অতি প্রাচীন স্থান থেকে সম্পূর্ণ ভারতীয় নকশায়, ভারতীয় প্রয়াসে নির্মিত একটি চমৎকার নবীন স্থাপত্যের আবাসে উপস্থিত থেকে মন থেকে সার্বিক ভাবে ইংরেজের কাছে পরাধীন থাকার হীনম্মন্যতাকে সম্পূর্ণ মুছে দিতে পারি।

এমন একটি বিরল ঐতিহাসিক মুহূর্তে অনুপস্থিত থেকে বিরোধীরা মোদীকে নীচে নামিয়ে আনার পরিকল্পিত প্রয়াসের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে নিজেরাই সম্পূর্ণ খাটো হয়ে গেলেন। একটি বাড়তি রাজনৈতিক সাফল্য জোগাড় করতে গিয়ে ভারত ইতিহাসের এক বিরল ঐতিহাসিক দিনকে তাঁরা নিতান্তই প্রধানমন্ত্রীর একান্ত নিজস্ব ইভেন্ট করে দিলেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে না চাইতেই প্রচারের এক বাঁধভাঙা বন্যা বয়ে গেল যেটা আদৌ তাঁর ক্ষতি করবে না। আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি এই নবনির্মিত সংসদ ভবনে প্রত্যাশিত ভাবেই স্থাপত্যগত ভাবে ফুটে উঠেছে। মনে হয় এর একটি বিশিষ্ট ভারতীয় নাম দিলেও মন্দ হতো না। এই সংসদে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ সকল সম্প্রদায়ের পরিচয়চিহ্নগুলি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভারতবর্ষের বহুবিধ সংস্কৃতির বিরাজমানতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই ভবনের গাত্রে গাত্রে প্রতিফলিত, বিশেষ করে যে সমস্ত ঘটনা ভারতীয় সভ্যতাকে ক্রমোন্নতির পথে নিয়ে গেছে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, জাতীয় পাখি ময়ূর, জাতীয় পুষ্প পদ্ম, সেন্ট্রাল লাউঞ্জে বিখ্যাত বটবৃক্ষের উপস্থিতি-সহ ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির আরও বহু গর্বের প্রতীকচিহ্ন সামগ্রিক স্থাপত্য পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পেয়েছে।

নিজের দেশের সংসদকে দেশ-ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দেশবাসীর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে নতুনভাবে নির্মাণের সুযোগ মোদীর আগের সমস্ত প্রধানমন্ত্রীরাই পেয়েছিলেন। এমনকী এই নির্মাণ যে জরুরি ছিল তা নিয়ে গত শতাব্দীর ৯০-এর দশক থেকেই বহু আলোচনা চলছিল। কিন্তু বাস্তবতা দেখিয়ে একমাত্র নরেন্দ্র মোদী নির্ভয়ে ও সগর্বে এই প্রকল্প নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এবং সংক্ষিপ্ততম সময়ে এর পূর্ণ নির্মাণ সম্পন্ন করে অসাধারণ কাজ করে জাতিকে গর্বিত করলেন। এই নতুন সংসদ ভবনের নকশা তৈরি করেছেন একজন ভারতীয় স্থাপত্যবিদ (বিমল প্যাটেল)। সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ করেছেন বিশ্বখ্যাত টাটার একটি সংস্থা। সামগ্রিক শ্রম দান করে ইটের পর ইট , সেই ইট-কাঠ-পাথরে লাবণ্য দান করেছেন ৭ হাজার ভারতীয় শ্রমিক। সত্যিই এটি একটি সর্বাংশে ভারতীয় সংসদ যা আদ্যোপান্ত ভারতীয়ের দ্বারা ও ভারতীয়দের জন্য তৈরি হয়েছে। এমন সুযোগ একটি শতাব্দীতে আসে কিনা সন্দেহ।

ইতিহাস কোন ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখে, কাকে পরিত্যাগ করে, বিরোধীদের যে বিষয়ে একটু প্রাজ্ঞতা দরকার ছিল। ২০৭২ সালে যেদিন ভারতীয় গণতন্ত্র ১২৫

বছরের সুবর্ণ বয়সে উপনীত হবে সেদিনকার ভারতবাসী বলবেন, দ্যাখ, এই চমৎকার সংসদ ভবনটি নরেন্দ্র মোদী নামের এক প্রধানমন্ত্রী নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু মনে হয় যারা অনুপস্থিত রইল তারা মনে করেছিল সেদিনের সেই মহামূল্য ঐতিহাসিক ফোটো অ্যালবামে তাদের উদ্যোগহীন ছবিগুলি যেন যুক্ত না হয়।

আসলে একেবারে সরাসরি বয়কট করার মধ্যে আপাতভাবে কর্ণাটকে কংগ্রেসের জয়ের অহংকার সুপ্ত আছে। কংগ্রেসের সঙ্গে সমগ্র বিরোধী দলগুলিই ভাবছে তাদের 'ব্রাহ্মমুহূর্ত' সমাগত হতে চলেছে। কর্ণাটকে সূর্যোদয় ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তারা বিজেপির হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারত তৈরির স্বপ্নকে তছনছ করে দেবে। তারা জিতবে। হায়! কিন্তু এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে, অনুপস্থিত থেকে তারা বাস্তবে যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে পালিয়েই গেল। হ্যাঁ, যদি তাদের মনে হয় যে বিজেপি সংসদীয় গণতন্ত্রকে নষ্ট করছে সেক্ষেত্রে তাদের বিজেপিকে একহাতে কাজ করার কোনো সুযোগই তো তাদের দেওয়ার কথা নয়। সব সময় শ্যেনদৃষ্টি রাখা উচিত।

বিরোধীরা নতুন যুক্তি দিয়েছে যে সংসদ ভবন উদ্বোধন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর করা উচিত, প্রধানমন্ত্রীর নয়। এই সূত্রে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের প্রেস সেক্রেটারি এসএস খান সংসদীয় রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে ব্যাপক সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁর মত অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী অনায়াসে সংসদ ভবন উদ্বোধন করতে পারেন। এটি তাঁর অধিকারভুক্ত। এ বিষয়ে আমাদের নির্দেশ গ্রন্থে কিছুই নির্দিষ্ট করে লেখা নেই। একেবারে বিষয়ভুক্ত নির্দেশাবলীও নেই। এবারের বিষয়টি ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি ঘটনা। এই নির্মাণের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীর। এটির সার্বিক নির্মাণও তারই পরিচালনায়। রাষ্ট্রপতির এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে আশীর্বাদ করার অধিকার অবশ্যই রয়েছে।

আর ২৮ মে উদ্বোধন দিবস ও সাভারকরের জন্মদিন একই দিনে পড়েছে। বিজেপির এই দিনটিকেই বেছে নেওয়াও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। দল খুব ভালোভাবেই জানত কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী তীব্র সাভারকর বিরোধী। তিনি এতটাই বিরোধী যে কোনো কিছু বিচার বিবেচনা না করেই তিনি সাভারকরের যা নীতি আদর্শ তার বিপরীতে অবস্থান করেন। কিন্তু উদ্ধব ঠাকরে বা শরদ পাওয়ারের সাভারকর সম্পর্কে অবস্থান কী? এঁদের কাছে সাভারকর তো আদর্শগত ভাবে প্রেরণাপুরুষ। বয়কটে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিয়ে মহারাষ্ট্রের এই রাজনীতিবিদরা সাভারকারকে অভিবাদন জানাবার একটি সেরা সুযোগ হেলায় হারালেন। বিজেপি আরও জানত যে বামপন্থী দলগুলি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে উদ্বোধন অনুষ্ঠান মানেই তা নানা ধরনের হিন্দু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের দিকে ঝুঁকবে, তাই তাদের পক্ষে অংশগ্রহণ অস্বস্তিজনক। একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রাদেশিক দলগুলির অধিপতিদের দুটি পা একটি ওপর একটি চাপিয়ে বসে বসে মোদীর পুরোহিতের মন্ত্র অনুযায়ী জলদকণ্ঠে যজ্ঞমন্ত্র উচ্চারণ দর্শন করা আদৌ সুখকর হবে না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যদি তারা মানসিক ক্লেশ সহ্য করেও অংশগ্রহণ করত সেক্ষেত্রে বিজেপির সদা তাদের হিন্দু বিরোধী তকমা দেওয়ার গ্রহণযোগ্যতা হয়তো কিছুটা কমত।

কিন্তু বিজেপি এটা জানলেও বিরোধীদের বেশ কিছু দল ধর্মীয় আচার ছাড়াই কোনো অনুষ্ঠান যে বেশি পছন্দ করে তার অসারতার প্রমাণ করতে ১৯৪৭ এই ন্যায়দণ্ড নিয়েই কেমন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়েছিল তা উঠে আসে। গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ এই সূত্রে কংগ্রেসকে স্মরণ করিয়ে দেন যে এই ধর্মদণ্ড (সেঙ্গল/তামিল) গ্রহণ করার সময় জওহরলাল নেহরু শুধু পীতাম্বর বস্ত্রই পরিধান করেননি দণ্ডটি নিয়ে চলাচলও করেছিলেন। সেটা ছিল ১৯৪৭ সাল।

একটা প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করা যায় যে, সরকার প্রাদেশিক নেতাদের সঙ্গে আলাদাভাবে যোগাযোগের চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু এরই বিপরীতে বিরোধীদের তুমুল হুংকার 'গণতন্ত্রের আত্মাকেই সংসদ থেকে উৎপাটিত করা হচ্ছে' এটি মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেল যে তারা ঠাণ্ডা মাথায় অনুষ্ঠানের সাক্ষীই হতে পারলেন না।

হায়! এর পরিবর্তে মমতা ব্যানার্জি, রাহুল গান্ধী, এম কে স্টালিন এঁরা যৌথভাবে বিজেপি ও মোদীকে চিরকালের জন্য অবিস্মরণীয় এই মুহূর্তের স্রষ্টা করে দিয়ে ভারতের জাতীয়তাবোধের একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঋত্বিকও করে দিলেন।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শোকসংবাদ

পুরুলিয়া জেলার তুনতুড়ি সুভাষ- বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য সমীর মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২২ মে পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁর মা, সহধর্মিণী, ১ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি পুরুলিয়ার শেষ প্রান্তে ঝাড়খণ্ড সীমান্ত এলাকার বিদ্যাভারতীর সজাগ প্রহরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মোদী সরকারের নয় বছর

২০১৪ সালের ২৬ মে তৎকালীন কংগ্রেসের মদনমোহন সিংহ সরকারকে গদিচ্যুত করে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসীন হন নরেন্দ্র মোদী। বিপুল প্রত্যাশার চাপ ছিল তাঁর ওপর। নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তিনি। ২০১৯ সালে আবার বিপুল জনসমর্থন নিয়ে তাঁর প্রত্যাবর্ত বুঝিয়ে দিয়েছিল ভারতবাসীর আস্থা তাঁর ওপর অটুট। এখন মোদী সরকারের নয় বছর পূর্তিতে তাঁর কাজকর্মের কাটাছেঁড়ার সময় হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই দলের তরফ থেকে তাঁর সরকারের যাত্রাকে স্মরণীয় করে রাখতে বিজেপির বিশেষ পরিকল্পনা, রাজস্থানের আজমের থেকে প্রচার শুরু করবেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারের সাফল্য প্রচারের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, নরেন্দ্র মোদী সরকারের নয় বছরের কাজের প্রচারের জন্য হিন্দি, ইংরেজি ছাড়াও রাজ্যগুলির জন্য আঞ্চলিক ভাষায় প্রচারের পরিকল্পনা নিয়েছে। উল্লিখিত ত্রিশদিনের মধ্যে প্রতিদিনের নতুন বিষয়বস্তু সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে। একইভাবে বিভিন্ন ভিডিয়ো ও বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সরকারের সমস্ত কাজের প্রচার চালানো হবে।

এই প্রচারের সময় একটি বিষয়ের ভিডিয়ো চালানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এরজন্য চারটি ভিডিয়ো সিরিজ চালানো হবে যাতে মোদী সরকারের নয় বছরের সাফল্যকে তুলে ধরা যায়। তার মধ্যে রয়েছে উজ্জ্বলা যোজনা, এছাড়াও থাকছে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বন্দে ভারত ট্রেনের যাত্রা। সেইসঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কোভিড ভ্যাকসিন পৌঁছে দিয়ে মোদীর নেতৃত্বে ভারত যে মহামারীর বিরুদ্ধে বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে সেই সাফল্যের খতিয়ানও থাকবে।

একই সঙ্গে কোভিড পরিস্থিতিতে আশিকোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন বিতরণ, আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে বিশ্বের বৃহত্তম জনস্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মসূচির উল্লেখও থাকছে। মোদী সরকারের আমলে পরিকাঠামো খাতে বিপুল ব্যয়বরাদ্দ হয়েছিল এবং সেই বিষয়ে মোদী সরকার সাফল্যের মুখও দেখেছে। বিজেপি সরকারের আমলে গত নয় বছরে ভারতে চুয়াত্তরটি বিমানবন্দর তৈরি হয়েছে।

চুয়ান্ন হাজার কিলোমিটার জাতীয় সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি ১১১টি জলপথ এবং ১৫টি শহরে রেল চালু করা হয়েছে।। সেই সঙ্গে ১৭টি বন্দে ভারত ট্রেন চালু করা হয়েছে। ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ, বারাণসীতে কাশীবিশ্বনাথ কড়িডোর, উজ্জয়িনীতে মহাকাল প্রকল্পের মতো সাফল্যও দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চাইছে বিজেপি।

তথ্যাভিজ্ঞমহলের মতে, নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপারে বিগত নয় বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার কোনো তুলনা হয় না। কিন্তু বাজার গরম করতে দেশের একশ্রেণীর মিডিয়া বিরোধীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দেশকে অশান্ত করতে চাইছে। কিন্তু বিগত নয় বছরের পরিসংখ্যান অন্য কথা বলছে। মহিলাদের কথা মাথায় রেখে ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা চালু হয়। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল ২০২০ সালের মার্চের মধ্যে দেশের ৮ কোটি পরিবারকে রান্নার গ্যাস সংযোগ প্রদান করা, আরও বেশি সংখ্যক মহিলারা যাতে এই প্রকল্পের সুযোগ নিতে পারেন তারজন্য ২০২১-২২ অর্থবর্ষে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা ২.০ শুরু হয়।

এছাড়াও রয়েছে সরকারের স্বপ্নের প্রকল্প--- সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা যা মেয়েদের শিক্ষা বা বিয়ের জন্য তহবিল। নয় বছর আগে যখন এই স্কিমটি শুরু হয়েছিল তখন সুদের হার ছিল ৯.১ শতাংশ, কিন্তু ২০১৫ সালে তা বাড়িয়ে ৯.২ শতাংশ করা হয়। বর্তমানে মন্দার বাজারে সুদের হার কিছুটা কমলেও অর্থনীতিবিদরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, এখনো অপেক্ষাকৃতভাবে এই প্রকল্পে সুদের হার যথেষ্টই বেশি, ৮ শতাংশের মতো।

কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধে এবং শিশুকন্যাকে শিক্ষিত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্প 'বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও'। মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন স্কিমে রাজ্যের গ্রামীণ ও শহরের পঞ্চাশ হাজার মহিলাকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির বিশেষ ঘোষণা। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২ সালের সেপ্টম্বরে কর্মরত মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। প্রকল্পের অধীনে কর্মরত মহিলাদের মৃত সন্তান প্রসব হলে অথবা জন্মের পরে সন্তানের মৃত্যু হলে ৬০ দিনের বিশেষ মাতৃত্বকালীন ছুটির ঘোষণা করে। সরকারি আদেশনামায় বলা হয়, জন্মের পরপরই শিশুর মৃত্যুর কারণে মায়েদের মানসিক যে ক্ষতি, তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে ৬০ দিনের ছুটির বিধান রাখা হয়েছে। □

শিক্ষক নিয়োগের মানদণ্ডে বিএড কি আদৌ প্রয়োজন?

সুদীপ্ত গুহ

শোনা যাচ্ছে একটা বেসরকারি বিএড কলেজ মালিকদের সংগঠন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছে চার বছরের বিএড চালু করার জন্য। তাঁদের আরও দাবি, একমাত্র চার বছরের বিএড করা প্রার্থীদেরই যেন শিক্ষকতার সুযোগ দেওয়া হোক। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে মধ্যমেধা এবং নিম্নমেধার স্কুল শিক্ষাব্যবস্থাই রাজত্ব করবে আগামীদিনে। বেসরকারি বিএড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লুঠের ক্ষমতা বাড়বে। তৃতীয় শ্রেণীর বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিক্যাল কলেজের মতো, অলিতে গলিতে তৃতীয় শ্রেণীর বেসরকারি বিএড কলেজ গজিয়ে উঠবে মধ্যবিত্তকে লুট করার জন্য।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনাশের জন্য মানুষ যেমন জ্যোতি বসুকে দায়ী করে, তেমনি আগামী প্রজন্ম দেশের বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা সর্বনাশের জন্য বর্তমান সরকারকে দায়ী করবে। যদিও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বড়ো ক্ষতি চোদ্দো বছর আগেই হয়েছে, যখন ড. মনমোহন সিংহ সরকার তার অবাস্তব শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ চালু করে। বর্তমান কেন্দ্র সরকারের প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষা নীতি খাঁটি দুধ, যা আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থাকে পৃথিবীর সেরা শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত করতে চলেছে। এর মধ্যে এই বিএড প্রস্তাব গ্রহণ করলে এই এক ফোঁটা চোনা নির্ভেজাল দুধকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেবে।

বিএড কি আদৌ প্রয়োজন? সহজ ভাষায়, এর প্রয়োজনীয়তাটা দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক, শিক্ষকতার চাকরি করার ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে কি বিএড দরকার? দুই, ভালো শিক্ষক হওয়ার জন্য কি বিএড আদৌ প্রয়োজন?

প্রথমে আসি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে। MIT/Harvard/IIT কোথাও পড়াতে বিএড প্রয়োজন হয় না। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য এই ডিগ্রি দরকার হয় না। সত্তরের দশকের আগে বিএড ছাড়াই শিক্ষকরা পড়াতে আসতেন। সেই সময় সরকারি এবং বেসরকারি দুই ক্ষেত্রেই শিক্ষা ব্যবস্থা আজকের চেয়ে বহুগুণে ভালো ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিসিন, আইন, সিএ থেকে ম্যানেজমেন্ট/সিভিল সার্ভিস-সহ যে কোনো প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে সব শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ দেন, তাঁদের ৯৯.৯৯ শতাংশের বিএড নেই। তবু স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কেন তাঁদের কাছে প্রশিক্ষণ নেন? কারণ তাঁদের জ্ঞান বেশি এবং প্রশিক্ষণের ক্ষমতা বেশি। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সেটাই একমাত্র বিবেচ্য।

অনেকেই হয়তো বলবেন, ছোটোদের পড়াতে বিএড দরকার, যা বড়োদের প্রয়োজন নেই। কথা হচ্ছে, বিএড শিক্ষা যদি শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেয়, তবে সেটা কেজি থেকে পিজি সবার প্রয়োজন। আর এই বিদ্যা যদি শিক্ষকের চরিত্রগঠন, শিক্ষক-পড়ুয়া সম্পর্ক নিয়ে হয়, তবে তা অনেক বেশি প্রয়োজন উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণায়। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ কিংবা নিপীড়ন অনেক বেশি হয় উচ্চ শিক্ষায়। আজকের দিনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দুর্ব্যবহারের ভয়ে বহু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী গবেষণা করতে চান না।

বিএড ডিগ্রি কি শিক্ষকের শিক্ষকতার মান, তাঁর জ্ঞান কিংবা পড়ুয়াদের কাছে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে? ধরা যাক স্কুলে একজন আঁকার শিক্ষক দরকার। একজন এসেছেন বিশ্বভারতী থেকে স্নাতকোত্তর করে, কিন্তু বিএড নেই (আমরা সবাই জানি, বিশ্বভারতীতে সুযোগ পাওয়া থেকে পাশ করা, পুরো ব্যাপারটাই বেশ কঠিন)। অপরদিকে একজন কোনো বেসরকারি শিক্ষায়তন থেকে পাশ করে, তারপর দু' লক্ষ খরচ করে একটা বিএড ডিগ্রি কিনে চলে এলেন। কাকে আমরা শিক্ষকতার সুযোগ দেব?

বর্তমানের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রথমজন সুযোগই পাবেন না। কিন্তু আমরা যদি আমাদের সন্তানদের সত্যিকারের আঁকা শেখাতে চাই, আমরা কি দ্বিতীয়জনকে গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করবো? তাহলে সরকারি নিয়োগের সময় আলাদা নিয়ম কেন বানাচ্ছি? শিক্ষক নির্বাচনের যে মানদণ্ড আমাদের সন্তানদের গৃহশিক্ষক খুঁজতে ঠিক করছি, সরকারি বা বেসরকারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন সেই মানদণ্ড পালটে দেওয়া হচ্ছে? পদার্থবিদ্যার শিক্ষক এমন একজনকে নিয়োগ করতে হবে, যিনি পদার্থবিদ্যাটা ভালো জানেন। পদার্থবিদ্যা কম জানা কেউ যদি বিএড ডিগ্রি কিনে নিয়ে আসেন তাঁকে কেন অগ্রাধিকার দেওয়া হবে?

প্রথম নির্বাচন হওয়া উচিত বিষয়ের জ্ঞান এবং তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কুলে (সরকারি এবং বেসরকারি) নিয়োগের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে না বলেই বাবা-মা তাঁদের সন্তানদের কোটা বা হায়দরাবাদে পাঠাচ্ছেন অঙ্ক, বিজ্ঞান শেখাতে। বিভিন্ন সেমিনারে, টিভি আলোচনায় অনেকেই কোটা ফ্যাক্টরির সমালোচনা করেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, কোটার ওই মাস্টারমশাইরা কেন সরকারি স্কুলে বা বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতার সুযোগ পেলেন না বা সেখানে এলেন না? তাঁরা যে উচ্চতায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেন, সাধারণ স্কুল শিক্ষকরা কেন সেই মান রাখতে পারেন না?

এখানে আরও একটি প্রশ্ন আসে। শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি কি আরও কড়া হওয়া উচিত, যেখানে বিএড না থাকলে মাস্টারি করার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া উচিত, নাকি আরও উদার হওয়া উচিত, যেখানে বিভিন্ন নেচারাল এন্ট্রির রাস্তা খোলা রাখা উচিত? যেমন, একজন শিক্ষক ধরা যাক কোনো কারণে ঠিক বয়সে শিক্ষকতার চাকরি পাননি। কিন্তু পরে গৃহশিক্ষকতা করে নিজেকে এমন জায়গায় নিয়ে গেলেন যে পাঁচ গ্রামের ছেলে-মেয়ে তাঁর কাছে পড়তে আসে। এমন মানুষকে কীভাবে আমাদের সিস্টেমে আনা যায় সেটা কী আমাদের ভাবা উচিত নয়?

আবার ধরা যাক, কোনো গুণী মানুষ ৩০ বছর আমেরিকায় পড়িয়ে দেশে ফিরতে চান, যাতে ওই দেশের সিস্টেমের ভালো জিনিস আমাদের ছাত্রদের দেওয়া যায়। কীভাবে তাঁকে সিস্টেমে আনা যায়? তিনি অর্থাৎ ওই কোটা বা হায়দরাবাদের শিক্ষকরা। যাঁদের কাছে পড়তে বাবা-মা স্কুল ছাড়িয়ে ডামি স্কুলে বাচ্চাদের ভর্তি করতে পিছপা হয় না। প্রসঙ্গত, ডামি স্কুল হলো সেই স্কুল যেখানে বহু পড়ুয়াকে নাম লিখিয়ে রেখে কোটা, দিল্লি বা হায়দরাবাদের কোচিঙে ভর্তি করা হয় বাচ্চাদের। আগেই বলা হয়েছে, কোটা ফ্যাক্টরির যতই সমালোচনা করি না কেন, তাঁরা যেভাবে গণিত ও বিজ্ঞান পড়ান, অধিকাংশ স্কুল শিক্ষক তা পারবেন না। কিন্তু কোটা বা হায়দরাবাদের শিক্ষকদের অনেকেই ইঞ্জিনিয়ার; পদার্থবিদ্যা,

রসায়নবিদ্যা বা গণিতশাস্ত্রের স্নাতক নন। অথচ তাঁদের পিছনে দেশ দৌড়াচ্ছে কেন? এঁদের কীভাবে সিস্টেমে আনা যায়?

এখন প্রশ্ন, পড়ুয়ারা সরকার নির্ধারিত মানদণ্ডে পাশ করা শিক্ষকদের ফেলে অন্য কোথাও যাচ্ছে? কারণ নির্বাচনের মানদণ্ডে ভুল আছে। যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শিক্ষকতায় আসছেন না বা নিয়ম তাঁদের আসতে দিচ্ছে না। সবচেয়ে বড়ো বাধা এই বিএড। ধরা যাক, একজন বোটানির ছাত্র পিএইচডি করেছেন এবং তাঁর ইচ্ছে ছিল কলেজে পড়াবেন। কিন্তু কলেজে সুযোগ পেলেন না। যেমন গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে কলেজে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের পরিমাণ ছিল নগণ্য। এখন তিনি যদি স্কুলে পড়াতে চান, আজকের নিয়ম অনুযায়ী তিনি সেই চাকরি পাবেন না । কারণ পিএইচডি করলেও, তাঁর বিএড নেই। ফলে, একদিকে অবিচার করা হলো এই ব্যক্তির উপর, অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিও অবিচার করা হলো। আগামীদিনে চার বছরের বিএড ডিগ্রি না থাকলে যদি শিক্ষকতার চাকরি পাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, সেরা মেধা শিক্ষকতায় আসবেই না এবং বঞ্চিত হবে পড়ুয়ারা। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপারটাকে আমাদের আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে।

কয়েকদিন আগে চীন ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি মন্তব্য করে। সেটা হলো, জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ (Demographic Dividend) পেতে গেলে জনগণের সংখ্যার থেকেও দেশবাসীর মানব সম্পদের মান বৃদ্ধি বেশি প্রয়োজন। এই কথায় আমাদের কিছুটা খারাপ লাগলেও, মানবসম্পদের মানের ব্যাপারে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। বলাই বাহুল্য, স্কুল শিক্ষাই এর ভিত। একটা ছোটো উদাহরণ দিলে এই ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে গত সাড়ে চার দশক শিক্ষায় চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে সরকারি মদতে। যার হাতে পয়সা আছে, সে বেসরকারি স্কুলে সন্তানকে পাঠিয়েছে। কিন্তু সেখানেও মান নিম্নগামী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। এর ফল কী? আজকের দিনে ক্যানসার থেকে চোখের চিকিৎসা করতে বাঙ্গালি মুম্বাই, হায়দরাবাদ, চেন্নাই, ভেলোর যাচ্ছে। বাঙ্গালি ডাক্তারদের উপর রাজ্যবাসীর ভরসা এতটাই কমে গেছে যে তাঁরা মুম্বাইয়ের টাটা ক্যানসার হাসপাতালে যাচ্ছে, কিন্তু কলকাতা টাটা হাসপাতাল হলে এড়িয়ে চলে। চেন্নাই অ্যাপোলোতে যায়, কিন্তু কলকাতা অ্যাপোলোর উপর ভরসা নেই।

কলকাতার ইঞ্জিনিয়ারদের অবস্থা এতো খারাপ যে পোস্তায় বিবেকানন্দ ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার ছয় বছর পরেও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি কীভাবে এই ব্রিজের পুনর্নির্মাণ করবে। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগেস নিজেদের বাঙ্গালিদের পার্টি হিসেবে দাবি করলেও, সুপ্রিম কোর্টে তাঁদের জন্য যে আইনজীবীদের নিয়োগ করছে, তারা সবাই অবাঙ্গালি। অধিকাংশ উচ্চপদস্থ আমলা, জেলাশাসক এবং পুলিশকর্তা অবাঙ্গালি। সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন, সিঙ্গুরকাণ্ডে বাঙ্গালি কেন অবিচল? কেন টাটা চলে যাওয়ায় বাঙ্গালিকে একটুও উদ্বিগ্ন করেনি? কারণ বাঙ্গালি নিজেকে ওই প্রকল্পে কোথাও বসাতে পারেনি। অধিকাংশ মানুষ জানেন, তাদের দক্ষতা বা যোগ্যতায় এখানে কাজ পাওয়া যাবে না। এখন যদি রাজ্যের যুবকরা সঠিক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ না পায়, কে তাঁদের কাজ দেবে? কেন এখানে শিল্প আসবে? ঠিক তেমনই, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যদি আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের মতো নিম্নগামী হয়, যেখানে মানুষকে শিক্ষাকে বহন করতে হয়, সে শিক্ষাকে বাহন করতে না পারে, তবে এই সিঙ্গুরের মতো ঘটনা অন্য রাজ্যেও ঘটবে না তো? বিনিয়োগ আমাদের দেশ ছেড়ে তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপিন্স, মেক্সিকো বা ভিয়েতনাম চলে যাবে না তো?

আরও একটা বড়ো উদাহরণ নেওয়া যাক। কম্পিউটার এবং পরিষেবা শিল্প। যা গত ত্রিশ বছর ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো শিল্প। সেখানে আজ অন্তত দু' ডজন ভারতীয় শীর্ষে বসে আছে। যেমন, সত্য নাদেলা, শান্তনু নারায়ণ, অরবিন্দ কৃষ্ণ, সুন্দর পিচাই, লীনা নায়ার, পরাগ আগরওয়াল, অজয় বাঙ্গা, জয়শ্রী উজ্জ্বল, লক্ষ্মণ নরসিংহন, ইন্দ্রা নুই, নীল মোহন, সঞ্জয় ঝা প্রমুখ। কিন্তু কোনো বাঙ্গালি নেই। এঁরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করেন তাঁদের নেতৃত্বে চলা বহুজাতিক সংস্থার স্থানীয় অফিস তাঁদের রাজ্যে খুলতে। এখানে বাঙ্গালির একটা বড়ো অসুবিধার জায়গা। কোনো বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থা কলকাতায় অফিস খোলার কথা ভাবে না। আমাদের ছেলে-মেয়েরা ওই শীর্ষ পদে পৌঁছাতে না পারার অন্যতম কারণ, সারা দেশের তুলনায় আমাদের রাজ্যের শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা। আগামীদিনে যদি আমাদের দেশ শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ে, সিলিকন ভ্যালিতে আমরা প্রতিনিধি পাঠাতে পারবো? আর তা যদি না পারি, বহুজাতিক সংস্থার বিনিয়োগ ভারত ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাবে না তো?

আরও একটা সমস্যা আছে। ধরা যাক একজন স্নাতকোত্তর প্রার্থী শিক্ষক হতে চান। তাঁকে চার বছরের বিএড করতে বলা হলো। সেক্ষেত্রে নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে স্কুলের পর তাঁকে আরও দশ বছর পড়াশোনা করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে কিছুতেই সেরারা শিক্ষকতার চাকরিতে আসবেন না।

একটা বিকল্প প্রস্তাব আসছে ওই লবি থেকে। চার বছরের বিএড-এর মধ্যেই সংশ্লিষ্ট বিষয় থাকবে। অর্থাৎ আমি ইতিহাসের শিক্ষক হতে চাই। আমাকে বিএ অনার্স না পড়ে চার বছরের বিএড পড়তে হবে যেখানে ইতিহাস বিষয়টি থাকবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পদ্ধতিতে একজন শিক্ষক কিছুতেই তাঁর বিষয়ের উপর তাঁর দক্ষতা বা পাণ্ডিত্য আনতে পারবেন না। শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মনৈপুণ্য (craftsmanship) এই বিএড শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু উদ্ভাবনী (creativity) বা ধীশক্তি (Wisdom) আসা অসম্ভব। আর এই ধীশক্তিই আমাদের দশ হাজার বছরের শিক্ষার উৎকর্ষের উৎস। এই ধীশক্তির ফলেই আমাদের দেশ মানব সভ্যতাকে দিয়েছে শূন্য, বীজগণিত, জ্যামিতি, আয়ুর্বেদ, শল্য চিকিৎসা, কলনবিদ্যা, অর্থনীতি থেকে বোসন কণার সন্ধান।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি ভারতকে স্বাধীনতার এই অমৃতকালে বিশ্বগুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্কিল ইন্ডিয়ার উপর বারবার জোর দিচ্ছেন। তার জন্য চাই সেরা শিক্ষক। সেরা পাঠ্যসূচি। ছোটো কোনো ভুল সিদ্ধান্ত এত বড়ো মহাযজ্ঞকে পণ্ড করে দিতে পারে। গত ৪৬ বছর পশ্চিমবঙ্গ যে ভুল করেছে, তা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। বিএড-এর মতো একটা ডিগ্রিকে শিক্ষক হওয়ার মানদণ্ড করা তার মধ্যে অন্যতম। শিক্ষাব্যবস্থা একটা মধ্য এবং নিম্ন মেধার বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হবে। মধ্যবিত্ত সমাজকে লুটতে তৈরি হবে আরও কিছু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সারা দেশ পশ্চিমবঙ্গের মতো পিছিয়ে পড়বে।

বিএড কি তাহলে একেবারেই অবাঞ্ছিত? না। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগের মানদণ্ড যেন বিএড ডিগ্রি একেবারেই না হয়। শিক্ষক নিয়োগ হবে শিক্ষকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর শিক্ষাগত যোগ্যতা, তাঁর জ্ঞান এবং তাঁর শিক্ষকতার ক্ষমতার উপর। একবার শিক্ষক পদে নির্বাচনের পর, তাঁকে আগামী পাঁচ বা দশ বছরে বিএড ট্রেনিং নেবার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেটাও পার্টটাইম হলেই যথেষ্ট।

□

অধিকারী থিসিস এবং ভারতের কমিউনিস্টদের দ্বিচারিতা

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় বারবার মুখরিত হয়েছে 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ' ধ্বনিতে। কিন্তু ভারতকে অনেক ভাগে ভাগ করার এই ধারণা কানহাইয়া কুমার বা ভারতবিদ্বেষী নিবেদিতা মেননের মাথা থেকে বের হয়নি বা অন্য কোনও জেএনইউ-ওয়ালার থেকেও আসেনি। যদিও তারাই এই নোংরা ধ্বনি দেয় কিন্তু তারা এটা বানায়নি। ভারতকে অনেক ভাগে টুকরো করার ধারণা ভারতের স্বাধীনতার আগে তৈরি হয়েছিল। রাষ্ট্রবাদী ধারণার সামনে এই ধারণা বহুবার চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে, তবুও এটা এখনো বেঁচে আছে কমিউনিস্টদের মধ্যে। ভারতকে টুকরো টুকরো করে ভাঙার ধারণা 'অধিকারী থিসিস' নামে পরিচিত, তাকে জিইয়ে রাখার জন্য মরণকামড় দিয়ে তারা চেষ্টা করছে বিগত আট দশক ধরে।

বিশিষ্ট কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক ড. গঙ্গাধর অধিকারী ছিলেন পাকিস্তান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান প্রবক্তা এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা। তিনি পৃথিবীর জঘন্যতম শঠতাপূর্ণ এক তত্ত্বের প্রবক্তা। তিনি ১৯৪২ সালে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে ভারত কোনো একটা জাতি নয়। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের দাবি যুক্তিপূর্ণ। যে কোনো অঞ্চলে একত্রে বসবাসকারী মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা একটা জাতি গঠন করে, তাদের অবশ্যই ভারতের অন্যান্য জাতিসত্তার মতো স্বায়ত্তশাসিত দেশ অর্জনের অধিকার আছে।' এটাই অধিকারী থিসিস— 'ভারতীয়তা কোনো একটি 'জাতীয়তা' নয়, ১৮টা জাতির সমষ্টি'। অধিকারী ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি রাশিয়া ও গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিস্ট পার্টির পরামর্শে ও অর্থদানে উদ্ভাবিত, গঠিত, পুষ্ট ও পরিচালিত হয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এখনও এই অধিকারী থিসিস বিশ্বাস করে।

তাই কমিউনিস্ট দলগুলো সর্বদা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে তাদের বিদেশি প্রভুদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে। রামস্বরূপ তাঁর বই 'হয়ার আর দে : কমিউনিস্ট আন্ডার কমিউনিজম'-এ লিখেছেন কমিউনিস্টদের কৌশল সহজ। এরা জনগণের 'অ-সর্বহারা' শ্রেণীকে শত্রু ধরে নিয়ে তাদের ধারাবাহিকভাবে নিকেশ করার বিধান দেয়। ব্ল্যাকমেইল, অপমান, চরিত্রহনন হচ্ছে এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যবহৃত বিশেষ পদ্ধতি। প্রতিপক্ষকে কলঙ্ক দিয়ে দাগিয়ে দেওয়া, তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং একে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়। কমিউনিস্টরা শেষ সমাজতন্ত্রী জীবিত থাকা পর্যন্ত 'রক্ষণশীলদের' সঙ্গে লড়াই করে। তারপর সমাজতন্ত্রীরা নিজেরাই ভেঙে যায় এবং একে একে আলাদা আলাদা ছিন্ন গোষ্ঠীগুলোকে বেছে তুলে নেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্টরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সকলকে মাটিতে পুঁতে দেয়। এইভাবে তাদের নির্যাতিতরা যখন 'যথেষ্ট দুর্বল হয়ে সংগ্রাম করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে দলের অভ্যন্তরীণ লড়াই আরও তীব্র হয়; এটা আরও খোলাখুলি ও প্রকট হয়ে ওঠে কারণ এটা একটা শারীরিক রূপ নেয়। গণতন্ত্রের প্রাধান্য থাকাকালীন যে ছাঁটাই পদ্ধতি ছিল তার স্থান নেয়

‘শারীরিক নিকেশ’। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, সাম্যবাদ এতটাই নির্মম আদর্শ যে সর্বোচ্চ নেতা ছাড়া কেউ সত্যিই নিরাপদ নয়।

মার্কস বলেছিলেন যে ‘জাতি রাষ্ট্র’ বা ‘নেশন স্টেট’ শোষণের হাতিয়ার, শ্রমিকদের কোনো দেশ হয় না। ভারতের দিশি কমিউনিস্টরা সর্বদা মার্কসের এই চিন্তাধারাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে অনুসরণ করেছে এবং তারা কমিউনিস্ট পৃথিবী গড়ার অসম্ভব স্বপ্ন পূরণের জন্য চেষ্টা করেছে। বারবার ভারতের কমিউনিস্ট নেতা ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলো দেশবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে। এরকম ২২টা উদাহরণ দেওয়া যায় যা থেকে বুঝতে সুবিধা হবে যে, কমিউনিস্ট দলগুলো স্বভাবগতভাবেই দেশবিরোধী।

১। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতে নয়, মধ্য এশীয় দেশ উজবেকিস্তানের (এককালে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত) রাজধানী তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন পার্টিটা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের (কমিন্টার্নের) নিয়ন্ত্রণে ছিল, যা সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব কমিউনিজমের পক্ষে ছিল। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ছিল সোভিয়েত প্রোপাগান্ডা মেশিন যার লক্ষ্য ছিল গ্লোবাল কমিউনিজম। সুতরাং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর জন্য ‘আগে পার্টি পরে দেশ’ এটা নতুন ব্যাপার নয়।

২। স্বাধীনতার আগে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যখন ইউএসএসআর এবং নাৎসি জার্মানি একই দিকে, তাদের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি ছিল, তখন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া হিটলারের বিরোধিতা করেনি। কিন্তু যেই হিটলার ১৯৪১ সালের জুনে চুক্তি ভেঙে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলেন, তখনই মস্কো ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্টদের বলল যে আসল লড়াই ফ্যাসিবাদ ও মিত্রশক্তির মধ্যে। আসলে হিটলারকে আটকাতে ব্রিটেনকে দরকার— জাতীয় স্বার্থ, কোনো শ্রমিক সর্বহারা শ্রেণীর সীমানাহীন আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব নয়— তাই ব্রিটিশদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতের কমিউনিস্টদের সমর্থন করা উচিত। সেহেতু ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন থেকে সিপিআই সরে গিয়েছিল। হঠাৎ করেই সিপিআই মিত্রশক্তির সবচেয়ে সোচ্চার সমর্থক এবং নাৎসিদের শত্রু হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে সরে সোভিয়েত ইউনিয়নের আদেশ পালন করে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

৩। ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গ প্রদেশে মানবসৃষ্ট কালান্তক দুর্ভিক্ষ হয়। সাড়ে ছয় কোটি জনসংখ্যার মধ্যে আনুমানিক ৪০ লক্ষ অনাহার, ম্যালেরিয়া, অপুষ্টি, জনসংখ্যার স্থানচ্যুতি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও স্বাস্থ্যপরিষেবার অভাবজনিত উদ্ভূত অন্যান্য কারণে মারা গেছে। যুদ্ধকালীন ঔপনিবেশিক নীতির কারণে সংকট আরও প্রকট হয়েছিল। কিন্তু এখানকার কমিউনিস্ট গোষ্ঠী ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের জন্য ব্রিটিশদের সমালোচনা না করে, দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে একটুও সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে ব্রিটিশদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছিল।

সিপিআই ও সিপিআইএম জাতীয় ইস্যুতে ভারত ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থে কখনোই পাশে দাঁড়ায়নি। ভারতের অন্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলো সেই নীতিই গ্রহণ করেছে।

৪। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল এবং গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ লেখক ও বুদ্ধিজীবী ফিলিপ স্প্র্যাটকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্য এমএন রায়ের সঙ্গে কাজ করতে পাঠায়। ১৯৫২-তে তিনি বলেছিলেন যে ভারতকে অবশ্যই কাশ্মীর উপত্যকায় তার দাবি ত্যাগ করতে হবে এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা শেখ আবদুল্লাহকে ‘স্বাধীনতার স্বপ্ন’ দেখার অনুমতি দিতে হবে। ভারতের কাশ্মীর থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা উচিত।

৫। যখন চীন তিব্বত আক্রমণ করেছিল, তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি চীনের এই পদক্ষেপের জন্য তাকে সাধুবাদ জানায়। কমিউনিস্ট পার্টির ৩১ মার্চের একটি বিবৃতিতে তিব্বতীদের মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য চীনাদের প্রশংসা করা হয়েছে। ভারতের সেই কমিউনিস্ট পার্টি যে বিজেপি সরকারকে কোনো কারণ ছাড়াই ফ্যাসিবাদী বলে চিহ্নিত করে, তারাই ফ্যাসিবাদের পক্ষে গিয়েছিল, তার জন্যই তারা চীনাদের সমর্থন ও সাধুবাদ জানাচ্ছিল। তারা শুধু চীনকে সমর্থনই করেনি বরং সমস্যা সৃষ্টির জন্য ভারতীয়দেরই দায়ী করেছে।

৬। লেখক কলামিস্ট আভাস মালদাহিয়ার দাবি করেছেন যে এইচ এস সুরজিৎ এবং অন্যরা সোভিয়েত কমিউনিস্টদের সঙ্গে একটি আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি গঠনের জন্য কাজ করছেন। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সোভিয়েত দূতাবাসের একজন আধিকারিক সিপিআই নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন একটি আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন স্থাপনের অনুরোধ পুনর্নবীকরণ করার জন্য। ডসিয়ারে আরও উল্লেখ করা হয়েছে সিপিআই নেতা বাসবপুন্নিয়ার মতে সিপিআই-এর অনুপ্রেরণার উৎস হওয়া উচিত কমিউনিস্ট চীন নয়, সোভিয়েত। এবং তিনি ঠিক যেভাবে শিষ্য তার শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেন ঠিক সেভাবে সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে কথা বলার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ততদিনে তারা চীনের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে।

৭। একই ডসিয়ারে বলা হয়েছে যে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে, অজয় ঘোষ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন যে চীন ও রাশিয়া জোর দিয়েছিল যে সিপিআই-কে ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে অনুপ্রবেশ তীব্র করে সশস্ত্র প্রতিরোধে সক্ষম একটি সদাতৎপর বাহিনী তৈরি রাখা উচিত। খুনি মাও-এর ছবি ছিল সেই প্রতিবেদনে। জানুয়ারির শেষের দিকে ২১তম সিপিএসইউ কংগ্রেসে অজয় ঘোষ প্রধানত মধ্যপন্থী সিপিআই-এর চারজনের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন; ৯ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের সমাপ্তিতে ঘোষ বেজিং-এ যান, সেখানে তিনি মাও ও চৌ-এন-লাই-এর সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

৮। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অনেকে প্রকাশ্যে চীনকে সমর্থন করেছিল। যুদ্ধের সময় ভারতের কমিউনিস্টি পার্টি ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য একটি রক্তদান শিবিরের আপত্তি জানায়। দলটি তাদের সদস্যদের ভারতীয় সৈন্যদের জন্য রক্ত না দিতে বলেছিল। সিপিআই(এম)-এর প্রতিষ্ঠাতা অচ্যুতানন্দন তাঁর সহকর্মী কমিউনিস্টদের অগ্রাহ্য করায় অবিলম্বে তাঁর পদাবনতি করা হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। চীন-ভারত যুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট দলগুলো যে পদক্ষেপ নিয়েছিল

তা সহজেই শোনা যায় পরবর্তীকালে 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান' ধ্বনির মধ্যে।

৯। কমিউনিস্টরা মরিচঝাঁপিতে নির্দয়ভাবে বাঙ্গালিদের গণহত্যা করেছে, যা জালিয়ানওয়ালাবাগের থেকেও ভয়ংকর। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বেশ কয়েকটি টহলদারি নৌকা এবং দুটো বিএসএফ স্টিমার ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৯ সালে সুন্দরবনের একটি দ্বীপকে ঘিরে ফেলে এবং নির্মমভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করে। সেই দ্বীপের নাম মরিচঝাঁপি। ৩১ জানুয়ারি দ্বীপবাসীরা প্রতিবাদ করলে তাদের উপর গুলি চালানো হয়। এভাবে কয়েকদিন চলে। শিশু-সহ ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছে। তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন দ্বীপটিকে 'অবৈধ দখলদার'দের থেকে মুক্ত করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতে জঘন্যতম গণহত্যাকে কমিউনিস্ট সরকার ধামাচাপা দেয়। চল্লিশ বছর পর বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের নৃশংস হত্যার কথা প্রকাশ্যে এসেছে। কমিউনিস্ট পার্টি দলিত ভোটব্যাংক ধরে রাখার জন্য দলিতদের নিয়ে কথা বলে, তারাই দলিতদের বিরুদ্ধে এই জঘন্য কাজ করেছিল।

১০। সিপিআইএম চীনের তিয়েন-আন -মেন স্কোয়ার গণহত্যাকে স্বাগত জানায়। সেখানে ১০৪৫৪ জন নিহত হয়েছিল। এটি 'চতুর্থ জুনের ঘটনা' নামে পরিচিত। ১৯৮৯ সালে বেজিঙের তিয়েন-আন- মেন স্কোয়ারে ছাত্রদের এক গণবিক্ষোভ হয়। অ্যাসল্ট রাইফেল ও ট্যাঙ্কে সজ্জিত সেনাবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করলে বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে সেনা গুলি চালায়। ১৫ এপ্রিল থেকে বিক্ষোভ শুরু হয় এবং ৪ জুন সরকার সামরিক আইন জারি করে, পিপলস লিবারেশন আর্মিকে কেন্দ্রীয় বেজিঙের কিছু অংশ দখলে রেখে জোরপূর্বক গণবিক্ষোভ দমন করা হয়। এ ঘটনায় হাজার হাজার ছাত্রযুব আহত হয়েছে।

১১। ১৯৯৮ সালে সিপিআইএম পোখরানে ভারতে পারমাণবিক পরীক্ষার বিরোধিতা করেছিল। সিপিআইএম উত্তর কোরিয়াকে পারমাণবিক শক্তি হিসেবে সমর্থন করেছিল কিন্তু একই কাজের জন্য তারা নিজের দেশ ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। তাদের কথায় উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক পরীক্ষার বৈধ অধিকার প্রয়োজন ছিল, ভারতের ছিল না। পোখরানে যখন ভারত পরমাণুধর শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, তখন সিপিআইএম-এর অজুহাত ছিল নিরস্ত্রীকরণ ও এবং সমস্ত ধরনের কথিত মানবিক উদ্বেগ। সিপিআইএম উত্তর কোরিয়ার এই পদক্ষেপের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে আঙুল তুলেছে। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন মার্কিন বিরোধী কঠোর অবস্থানের জন্য কিম জং-উনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

১২। জেএনইউ ক্যাম্পাসে কমিউনিস্ট ছাত্ররা বারবার দেশবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে। তাদের ছাত্র শাখাগুলো হলো এআইএসএ, এআইএসএফ, ডিএসইউ ও ডিএসএফ। তারা দেব-দেবীর নগ্নচিত্র, আপত্তিকর পোস্টার তৈরি করে কম্পিউটারে ছড়িয়ে দেয় এবং দেওয়ালেও লাগায়, হিন্দু ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়। তারা সংসদ হামলার অপরাধী আফজল গুরুর ফাঁসিতে শোক প্রকাশ করেছিল। তারা ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায় সিআরপিএফ জওয়ানদের হত্যার উৎসব উদ্‌যাপন করেছিল, তারা হোস্টেলের মেসে গোমাংস দাবি করেছিল, তারা 'নবরাত্র' উৎসবে দেবী দুর্গার জায়গায় 'মহিষাসুর' পূজা করেছিল। এবং তারা কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানিকেও সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানায়, তবে জেএনইউ কর্তৃ পক্ষ এতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কমিউনিস্ট অধ্যাপকরাও পড়ানোর মাধ্যমে প্রাচীনতম সভ্যতা ভারতকে টুকরো টুকরো করার জন্য তাদের অ্যাজেন্ডা চালায়। জেএনইউ-এর অধ্যাপক নিবেদিতা মেনন ছাত্রসমাবেশে বলতেন যে কাশ্মীর ভারতের অন্তর্গত নয়, আজাদির স্লোগান দিয়ে কাশ্মীরি মুসলমানরা ঠিক করছে এবং ভারতের উচিত কাশ্মীরকে স্বাধীনতা

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, গত জন্মাষ্টমী '২২ থেকে স্বস্তিকার ৭৫ বছর পালনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই অবসরে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি স্বস্তিকায় এযাবৎ প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের নির্বাচিত রচনার সংকলন। এটি আগামী অক্টোবর '২৩-এ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা।

গ্রন্থটির মূল্য ধার্য্য করা হয়েছে ৪০০ টাকা।

প্রকাশ পূর্ব মূল্য ৩০০ টাকা (অর্থাৎ ১৫ আগস্ট, ২০২৩ -এর মধ্যে যাঁরা সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়ে কপি বুক করবেন তাদের জন্য)।

১৫ জুন, ২০২৩ থেকে অনলাইনে ওই টাকা পাঠানো যাবে। অনলাইনে টাকা পাঠালে নিচের দেওয়া ফোন নম্বরে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। জেলা অনুসারে তালিকা-সহ টাকা জমা করতে পারেন।

যোগাযোগ—

শ্রী তপন সাহা — ৯৯০৩০০২৯০১

শ্রী মহিম দাস — ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭

অনলাইনে টাকা পাঠানোর Bank Details—

Name - Swastik Prakashan Trust
Bank - Punjab National Bank
Branch- Vivekanand Road, Kolkata-700006
A/c. No. - 0954000100121397
IFS Code - PUNB0095400

বিঃ দ্রঃ— নগদ টাকা স্বস্তিকা দপ্তরেই জমা দিতে হবে।
চেক দিলে Swastik Prakashan Trust—এই নামে চেক কাটতে হবে।

দেওয়া। তিনি গণভোটের কথা বলেন কিন্তু খুব সতর্কতার সঙ্গে গণভোটের জন্য অনুকূল পরিস্থিতির কথা লুকিয়ে রাখেন।

১৩। ফেব্রুয়ারি ৯, ২০১৬-এ সংসদে সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত সন্ত্রাসী আফজল গুরুর ফাঁসির তৃতীয় বার্ষিকী স্মরণে জেএনইউ-এর কমিউনিস্ট ছাত্ররা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। কানহাইয়া কুমার এআইএসএফ-এর সদস্য ছিলেন এবং জেএনইউ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। অনুষ্ঠানের সময় 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ' জাতীয় বিরোধী স্লোগানও উত্থাপিত হয়েছিল। সন্ত্রাসী আফজল গুরুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য জেএনইউ-এর দেশি কমরেডরা সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অভিযুক্ত করেছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠে 'আফজল হাম শার্মিন্দা হ্যায় তেরে কাতিল জিন্দা হ্যায়'। বারবার এই কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা ভারত থেকে কাশ্মীর ভাঙার বিষয়ে আওয়াজ তুলেছেন। ৮ মার্চ ২০১৬-এ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে কানহাইয়া কুমার ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংঘটিত কাশ্মীরি মহিলাদের ধর্ষণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই দাবিগুলো একেবারেই ধোপে টেকে না। এই ধরনের অর্থহীন ভাষণ, বাক্য, স্লোগান সর্বদাই কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের তালিকায় রয়েছে।

১৪। ২০১৭ সালে, ডোকলাম অচলাবস্থাকালে ভারত-চীনের মধ্যে মারাত্মক টেনশন তৈরি হয়। তবে ভারত পিছু হটেনি। সিপিআইএম চীনের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সিপিআইএম জোর দিয়েছিল যে ভুটানকে চীনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে দেওয়ার অনুমতি দিতে হবে ভারতকে এবং ভারতকে পিছিয়ে আসতে হবে। সম্ভবত সিপিআইএম-এর ধারণা ছিল চীন ভুটানের উপর কর্তৃত্ব করে বিতর্কিত ভূমি কেড়ে নেবে। এরা বিরোধের জন্য ভারত সরকারকে দোষারোপও করেছে— 'ভারত প্রকাশ্যে দক্ষিণ চীন সাগরে মার্কিন অবস্থানের পক্ষে, বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগের বিরোধিতা করেছে, দেশের মধ্যে ভারত দলাই লামা এবং তথাকথিত অস্থায়ী শাসনের মর্যাদা বাড়িয়েছে ইত্যাদি।

১৫। সিপিআইএম ও সিপিআই চায়নি ভারত-ইজরায়েলের কোনো বোঝাপড়া ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকুক। নিরাপত্তা, কূটনৈতিক ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত-ইজরায়েলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কমিউনিস্ট দলগুলো সর্বদা ইজরায়েলবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছে ও 'স্বাধীন প্যালেস্টাইন'-এর স্লোগান তুলেছে।

১৬। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-মার্কসবাদী ভারতের সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াতের কাশ্মীরে পাথর নিক্ষেপ বিষয়ে দেওয়া বিবৃতি— 'কাশ্মীরে পাথরবাজদের কঠোর মোকাবেলা করা হবে' তার বিরোধিতা করেছে। তারা কাশ্মীরি শিশুদের সামরিক বাহিনীর সৈন্যদের পাথর ছুঁড়তে উৎসাহিত করেছিল। কমিউনিস্টরা নিরাপত্তা বাহিনীকে ধর্ষক হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছে।

১৭। সার্ক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী কোভিড-১৯ সংকটে সার্ক দেশগুলোর জন্য তহবিল সংগ্রহের আহ্বান জানিয়েছিলেন। পাকিস্তান কাশ্মীর ইস্যু তোলায় সার্ক দেশগুলো এর জন্য পাকিস্তানের সমালোচনা করেছিল, কিন্তু কেবলমাত্র সিপিআইএম পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল।

১৮। ১৬ জুন, ২০২০-তে সীমা রক্ষা করার জন্য চীনা সেনাদের সঙ্গে হিংসাত্মক সংঘর্ষে, মাতৃভূমির জন্য ২০ জন ভারতীয় সেনা বীরগতিপ্রাপ্ত হন। চীনা পক্ষের ৪৩ জনের প্রাণহানি ঘটে। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনোবল বাড়ানোর পরিবর্তে এবং অন্যের অঞ্চল দখলের পদক্ষেপের জন্য চীন ও চীনা সেনাবাহিনীর সমালোচনা করার পরিবর্তে, ১৬ জুন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভের আয়োজন করে।

১৯। ২০২০ সালে লাদাখে ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অল ইন্ডিয়া পার্টি মিটিং হয়েছিল। বৈঠকে আশা করা হয়েছিল যে প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের মতাদর্শ নির্বিশেষে কেন্দ্রের পক্ষে থাকবে এবং তাদের মতভেদ ত্যাগ করে একত্রিত হবে, কারণ এটা জাতীয় অখণ্ডতার প্রশ্ন ছিল। কিন্তু সিপিআই ও সিপিআইএম-সহ তিনটি রাজনৈতিক দল এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে সরকারবিরোধী অবস্থান নেয়। সর্বভারতীয় পার্টি মিটিঙে কমিউনিস্টরা চীনকে নয়, মোদী সরকারকে দোষারোপ করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য। সিপিআই-এর ডি রাজা বলেছেন যে, 'আমাদের তাদের জোটে টেনে আনার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের সংঘর্ষে আমেরিকা চীনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য মিত্রদের সন্ধান করছে, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্ক ইতিহাসে কখনও এত ঘনিষ্ঠ ছিল না। সীতারাম ইয়েচুরি চীনের সঙ্গে মোকবিলা করার জন্য পঞ্চশীল নীতির উপর জোর দিয়েছেন।

২০। সম্প্রতি চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি ১০০ বছর উদ্‌যাপন করেছে। বেজিঙে বড়ো উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়। ভারতের চীনা দূতাবাসে একটি সেমিনারে ৪ কমিউনিস্ট নেতাকে ডাকা হয়েছিল— সিপিআইএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, সর্বভারতীয় ফরওয়ার্ড ব্লকের শীর্ষ নেতা জি দেবরাজন এবং ডিএমকে দলের একজন সংসদ সদস্য এস সেন্থিল কুমার। চীনের রাষ্ট্রদূত উচ্চস্তরের আলাপের জন্য সভাকে ব্যবহার করে তুলে ধরেন চীন চায় শান্তি, অনাগ্রাসন ও পারস্পরিক সম্মান। ৪ দিশি কমিউনিস্ট চীনের কূটনীতির মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল ও চুপচাপ বসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে অভিনন্দন জানান এবং সিপিসির তথাকথিত সাফল্য অর্জনের কথা উচ্চারণ করেন।

২১। স্ক্রুপহুপ-এ সাক্ষাৎকারে ইয়েচুরি স্পষ্ট বলেছেন, যে চীনের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। চীনে যে মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটছে যেখানে উইঘুর মুসলমানদের অঙ্গচুরি করা হচ্ছে সে সম্পর্কে সীতারাম ইয়েচুরি সরাসরি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে এই প্রতিবেদনগুলো বাজে এবং চীনে কোনও মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে না। তদুপরি সীতারাম ইয়েচুরি চীনে বাক্‌স্বাধীনতা খর্ব করার মধ্যে কোনো ভুল খুঁজে পাননি। এরাই নিজেদের বাক্‌স্বাধীনতার ধ্বজাধারী হিসেবে দেখায়।

২২। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো মাওবাদী/নকশালদের অর্থ দেয় যা ভারতের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কাজ চালাতে সহায়তা করে। এই মাওবাদী/নকশালদের কারণে নিরাপত্তা বাহিনীর হাজার হাজার জওয়ানের বলিদান হচ্ছে। তারা সহিংসতার মাধ্যমে কমিউনিস্ট পৃথিবীর স্বপ্ন পূরণ করতে চায়। ১৯৬৯ সালে কমিউনিস্ট নেতা চারু মজুমদার অস্ত্র দিয়ে কমিউনিস্ট স্বপ্ন অর্জনের জন্য সিপিআইএম-এল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সিপিআই ও সিপিআইএম জাতীয় ইস্যুতে ভারত ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থে কখনোই পাশে দাঁড়ায়নি। ভারতের অন্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলো সেই নীতিই গ্রহণ করেছে। □

দেশভাগের শোকে সাভারকর মাতৃবিয়োগের মতো কেঁদেছিলেন

প্রদীপ মারিক

সাভারকর কোনোদিন চাননি যে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে যাক। তিনি কোনোদিন দেশভাগের পক্ষে কথা বলেননি। তার প্রস্তাব ছিল একটি দেশে দুটি জাতির সহাবস্থান করা উচিত কিন্তু কোনো মতেই দেশভাগ করা উচিত নয়। তিনি খিলাফত আন্দোলনের সময় তুষ্টি করণের নীতির সমালোচনা করেন। গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে সাভারকর গভীর চিন্তা করেছিলেন তাই তিনি 'দ্য হিস্টরি অব ওয়ার অব ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স' লিখলেন। খবর পেয়ে ইংরেজ সরকার তোলপাড় শুরু করল। প্রকাশের আগেই ইংরেজ সরকার বইটি নিষিদ্ধ করলো। তিনি সর্বদা বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন বিহারী পালের মতো বিপ্লবীদের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি, স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করেন। আইন নিয়ে পাড়ার জন্য তিনি ইংল্যান্ডে যান। শুধু পড়াশোনা নয়, সেখানে ভারতীয় ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে ফ্রি ইন্ডিয়ান সোসাইটি নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

বীর সাভারকর ছাত্রদের ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং ফ্রি ইন্ডিয়া নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে তিনি 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৮৯৯ সালে তিনি মিত্রমেলা নামে এক সমিতি গড়ে তোলেন। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারার প্রসার এবং সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া। তাঁর ভাই গণেশ সাভারকর ইতালিয়ান নেতা মাতসিনির 'ইয়ং ইতালি' সংগঠনের অনুকরণে মিত্রমেলার নামকরণ করেন অভিনব ভারত। এর উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। সাভারকরের আদর্শে সারা দেশে 'অভিনব ভারতের' বিভিন্ন শাখা গড়ে ওঠে। সদস্যদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার, শরীর চর্চা, লাঠিখেলা প্রভৃতি প্রশিক্ষণ দিয়ে তরুণদের লড়াইয়ের যোগ্য করে তোলাই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। এক সুস্থ চিন্তাশীল দেশপ্রেমিকের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি যে সুদূরপ্রসারী তা স্তরে স্তরে উপলব্ধি করা এবং তার মর্মবেদনার রাজনৈতিক বিশ্লেষণাত্মক অনুশীলন ক'জন করতে পারে? করতে পারে একমাত্র সেই মানুষটি, যার অন্তরাত্মা সৎ এবং যিনি তেজস্বী। বিতর্ককে সঙ্গী করেও তিনি দেশ নায়ক। আবার বর্ণবৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা এই মানুষটি বীর সাভারকর।

আন্দামান জেলে কাটানোর সময়টি ছিল তার কাছে একটা অনুপ্রেরণার সময়। সেই সময় তিনি একটা বই লেখেন। তা ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসের পটভূমিকায় এক তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস। জেলে থাকাকালীন সাভারকর তার হিন্দুত্বকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। জেলে থাকার সময়ও তিনি হিন্দুত্বকে কোনোদিন ভোলেননি। হিন্দুত্ব প্রচারের জন্য তিনি জেলে বসে 'হিন্দুত্ব' নামে

এক আদর্শ প্রচারপত্র লিখেছেন। 'কে হিন্দু' নামে সেই প্রচারপত্র জেলের বাইরে বের করে এনে নীরবে বিতরণ করা হতো। ধীরে ধীরে এটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ হতে থাকে। সাভারকরের সমর্থকরা এই পুস্তক প্রচারের দায়িত্ব নেয়। তিনি হিন্দুত্বের মধ্যেও সর্বধর্মের সার্থকতা প্রচার করেন। তিনি নিজেকে হিন্দু বলে গর্ব করতেন। সর্বদা তিনি রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ে সচেতন করতেন যাকে তিনি হিন্দু হিসেবে দেখতেন। তিনি সর্বদা বৌদ্ধ, জৈন, সনাতন ধর্মের ঐক্যের জন্য প্রচার করতেন। সাভারকর কালাপানির শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করেন ১৯২৪ সালের ৬ জানুয়ারি। এরপর রত্নগিরি হিন্দুসভা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩৭ সালে হিন্দুধর্মের প্রতি আনুগত্য দেখানোর জন্য তাকে হিন্দু মহাসভার সভাপতি করা হয়। হিন্দু জাতি গঠনের এই প্রচেষ্টার জন্য তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সাভারকর আইন নিয়ে লন্ডনে পড়ার সময় অত্যাধুনিক বোমা এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কৌশল রপ্ত করেন এবং তা ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য পাঠান। তার অনুগামী বিপ্লবীরা কার্জন ইউলিকে হত্যা করেন। কার্জন হত্যার জন্য জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ সাভারকরকে গ্রেপ্তার করে। সাভারকর ছিলেন হিন্দু জাতীয়তাবোধের প্রবক্তা। হিন্দু মহাসভার সভাপতি থাকার সময় তিনি হিন্দু জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সেলুলার জেলে দীর্ঘ দশ বছর বন্দি ছিলেন। পোর্ট ব্লেয়ারের এয়ারপোর্টটি তার নামেই নামাঙ্কিত। তিনি উপনিবেশিকতার কবজা থেকে ভারতকে মুক্তি করার জন্য বিপ্লবের রাস্তা বেছে নেন। তিনি লিখলেন, 'যখনই ভুল শক্তি প্রয়োগ করে হিংসার মাধ্যমে জাতীয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনকে দমনের চেষ্টা করা হয়, তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া হিসেবেই বিপ্লবের জন্ম হয়, অতএব আমাদের উচিত এই আন্দোলনকে সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানানো। কারণ এটাই সত্য এবং সঠিক পথকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র উপায়।' লন্ডনে ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটিতে বিখ্যাত ভাষণ দেন, 'অমুক ব্রিটিশ বা তমুক অফিসারের নামে এই আইন বা কানুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুযোগ জানিয়ে কোনো লাভ নেই, আমাদের আন্দোলন কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা আইনের বিরুদ্ধে নয়, বরং নিজেদের আইন নিজেরাই অধিকার অর্জনের পক্ষে। সহজ করে বলতে গেলে সম্পূর্ণ স্বরাজ ও স্বায়ত্তশাসন।'

১৯০৯ সালে নাসিকের তৎকালীন কালেক্টর এএমটি জ্যাকসনকে হত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়ে অভিনব ভারত সোসাইটির এক সদস্য। তদন্তে জানা যায় তার কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া পিস্তলটি স্বয়ং সাভারকর জোগাড় করে দিয়েছিলেন। সাভারকর ধরা পড়েন এবং বিচারে তার পঞ্চাশ বছরের সাজা হয়। যা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চোদ্দ বছরেরও বেশি। জেলের কঠিন জীবন কাটানোর সময় তিনি জেলারকে লেখেন, '১৯১১ সালে আমি যখন এখানে আসি পার্টির অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে আমাকেও মুখ্য কমিশনারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমাকে ডি ক্লাসের আওতাভুক্ত করা হয়। ডি মানে ডেঞ্জারাস প্রিজনার, কিন্তু আমার সঙ্গে অন্যান্য কয়েদিদের ডি ক্লাসে ফেলা হয়নি। এরপর টানা ছয় মাস আমাকে একলা নির্জন কারাবাসে বাধ্য করা হয়। আর কাউকে কিন্তু এমন সলিটারি কনফাইনমেন্ট দেওয়া হয়নি। যদিও পুরো সময়কালে আমার ব্যবহার অত্যন্ত ভালো ছিল। অন্যান্য বন্দিরা ছাড়া পেয়ে গেলেও আমাকে জেল থেকে ছাড়া হয়নি। যারা অল্প দিনের কয়েদি তাদের কথা আলাদা কিন্তু আমার কপালে তো পঞ্চাশ বছরের সাজা লেখা। নৃশংস অপরাধী যে সুযোগ সুবিধা পায় সেই রকম সুযোগ যদি আমার জন্য বরাদ্দ না হয়, তবে আমি এই সুদীর্ঘ সময়ে বদ্ধ কুটুরিতে কাটাবো কী করে?' একজন জেলবন্দি তার দাবি আদায়ের জন্য পিটিশন জামা দিতেই পারে। একজন সাজাপ্রাপ্ত জেলবন্দি মেডিক্যাল ডায়েট পাওয়ার যোগ্য অথচ সে পাচ্ছে না সেই দাবি সে করতেই পারে। জেল মানেই বদ্ধকুটুরি নয়। এটা একজন প্রতিবাদী জেলবন্দি বলতেই পারে। কিন্তু এই পিটিশন নিয়ে নানা মহল থেকে সাভারকরকে বলা হয় তিনি নাকি ব্রিটিশদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করছেন। এক আপোশহীন স্বাধীনতাপ্রেমী বীরকে বিভিন্ন ভাবে দমানোর চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেস-কমিউনিস্টারা, কিন্তু সফল হয়নি।

চিত্রগুপ্ত তার 'লাইফ অব ব্যারিস্টার সাভারকর' বইতে উল্লেখ করলেন, সাভারকর আজন্ম এক সাহসী নায়ক। ফলাফলের তোয়াক্কা না করে তিনি যে কোনো কাজের দায়িত্ব নিয়ে তা সম্পূর্ণ করতে পিছপা হতেন না। তিনি ধর্মের নামে দেশভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। কোনোমতেই চাননি যে দেশভাগ হোক। কিন্তু দেশভাগ তাঁর জীবদ্দশায় হয়েছিল। দেশভাগের শোকে তিনি মাতৃবিয়োগের মতো কেঁদেছিলেন। সাভারকর বলতেন, এখানে পূর্বপুরুষের সূত্রেই ভারতীয়রা এই দেশকে পিতৃপুরুষের দেশ এবং ঈশ্বরের দেশ মানে। দেশ একটাই ভারতবর্ষ। এখানে যে ধর্মের লোকই হোক না কেন তাকে এই নিয়ম পালন করতে হবে। এটা চলতে পারে না। তাই তো হিন্দুত্বের সনাতন ধর্মের মূল কথাই তিনি তুলে ধরেছেন তার ভাবধারায়। সাভারকর দেখিয়েছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্য ধর্মের প্রতি আনুগত্য বেশি। সাভারকরের মৃত্যু যেন স্বেচ্ছামৃত্যুর নামান্তর। তিনি ঠিক করলেন উপবাস করবেন। ১৯৬৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি কোনো খাদ্য গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করেন ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ সালে। □

কর্ণাটকের জট

কর্ণাটকে কংগ্রেসের জিত হলো বটে, শঙ্কা কিন্তু কাটলো না। সিদ্দারামাইয়া ও শিবকুমারের মধ্যে রাজ্যের শীর্ষ পদ নিয়ে দ্বৈরথ কাটলো না। মুখ্যমন্ত্রীর পদ না পাওয়া মনেপ্রাণে মানতে পারলেন না শিবকুমার। তিনি কংগ্রেসের তিরিশ মাসের ফর্মূলায় প্রথম পর্বে গদিতে বসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হাইকমান্ড তা মানেনি। আসলে শিবকুমারের অভিপ্রায় ছিল যে, একবার আসনে বসতে পারলেই পাঁচ বছরের মতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে ফেলতে পারতেন। শিবকুমার ভাবছেন সিদ্দারামাইয়া একবার আসনে বসলে তিরিশ মাসের পর চেয়ার যদি না ছাড়েন— যেমনটা হয়েছে রাজস্থানে বা ছত্তিশগড়ে। রাজস্থানে গেহলত চেয়ার ছেড়ে দেননি সচিনকে আর বাঘেলা চেয়ার ছাড়েননি তাঁর দুই নম্বরকে। অতীতে আরও একটা ঘটনা ঘটেছে মায়াবতী ও বিজেপির জোট সরকারের আমলে উত্তরপ্রদেশে। জোটের শর্ত মতো মায়াবতী মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার ছেড়ে দেননি বিজেপিকে। সেই জোট ভেঙে সরকারের পতন হয়।

কর্ণাটকের দুই যুযুধান পক্ষ কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এটা স্পষ্ট হয়ে যায় শিবকুমারের কথায়। দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার জন্য ইডি গ্রেপ্তার করে এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করেন ক্ষমতাসীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাড়ি রাখবেন। কিন্তু কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হয়েছে, এবারও তিনি দাড়ি কাটছেন না কেন? এই সওয়াল এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন যে তিনি ধৈর্যশীল ব্যক্তি। এই জবাবের ইঙ্গিত তাৎপর্যপূর্ণ। কীসের ধৈর্যের কথা বলেছেন তিনি অর্থাৎ দাড়ি তিনি কাটবেন তিরিশ মাসের পর। আর সিদ্দারামাইয়া যদি বাঘেলা বা গেহলতের মতো গদি না ছাড়েন তবে কি তিনি দলে বিদ্রোহী হয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দল ভেঙে মহারাষ্ট্রের একনাথ শিন্ডের মতো কারুর হাত ধরে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেই দাড়ি কাটবেন? এর উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

সাংবাদিকরা যখন জানতে চায় মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রশ্নে তিনি কোনো সমঝোতা করবেন কি না। ঝানু রাজনীতিবিদদের মতো উত্তরে শিবকুমার বলেছেন যে, তিনি সমঝোতা না করলেও দলের স্বার্থে এই ফর্মূলা মেনে নিয়েছেন। এমন জবাবের একটি অর্থ হয় আর সেটা হলো সিদ্দারামাইয়া যদি চুক্তি অনুযায়ী গদি না ছাড়েন তাহলে বিদ্রোহী হবার ইচ্ছা ছাড়েনি। এই তিরিশ মাসের মধ্যেই লোকসভা নির্বাচন এবং এই নির্বাচনে শিবকুমারের নেতৃত্বে দল ভালো ফল না করলে সেখানে শিবকুমার আম ও ছালা দুটোই হারাতে পারেন। সেই আশঙ্কা থেকে এখনই দাড়ি কামাবেন না তিনি। তাই এই তিরিশ মাস শিবকুমারের দাড়ি কতটা লম্বা হয় সেটা দেখার অপেক্ষায় কর্ণাটকবাসী।

—**তারক সাহা,** হিন্দমোটর, হুগলী।

মমতা ব্যানার্জির দ্বিচারিতা

মমতা ব্যানার্জি দ্য কেরালা স্টোরি ছবিটি না দেখেই একে অসত্য ও বিকৃত কাহিনি বলে এ রাজ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। যে ছবি সিবিএফসি ছাড়পত্র দিয়েছে। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জানাই যে গোধরাতে ৫৯ জন করসেবককে জীবন্ত দগ্ধ করে মারার পর গুজরাটে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে নরেন্দ্র মোদীকে কালিমালিপ্ত করার জন্য মোদীবিরোধীরা চারটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করেছে। নির্মাতারা হলেন পঙ্কজ শঙ্কর, গোপাল মেনন, ললিত ভাসিন ও সৌমিত্র দস্তিদার। এই ফিল্মগুলি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ফিল্মের প্রথমে দেখানো হলো গোধরা স্টেশনে দাঁড়ানো একটি ট্রেন। আস্তে আস্তে যাত্রীরা সব নেমে গেল। তারপর আবছা অন্ধকারে স্টেশনের একটু দূরে ৩-৪টি পোড়া কামরা পড়ে আছে। ১-২ সেকেন্ড মাত্র ওই পোড়া কামরাগুলি প্রদর্শিত হলো।

এরপর পর্দায় ভেসে এল একের পর এক পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে যাওয়া মানব দেহের অংশ। সারি সারি মড়া মানুষ আর কণ্ঠস্বরে ভেসে আসছিল— 'আমার বোনের পেটে আট মাসের বাচ্চা আছে ওকে ছেড়ে দাও।' 'তলোয়ার দিয়ে তার পেট চিরে আট মাসের বাচ্চাটাকে বের করে আধমরা বোনের সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছিল ওরা' ইত্যাদি। এই চারটি ফিল্ম ভারতের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় এবং বিদেশেও প্রদর্শিত হয়েছিল। ২০০৪ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট তাদের প্রচারাভিযানে একটি সিডি প্রদর্শন করতো, দেখানো হতো কউসর বানু নামে আসন্নপ্রসবা এক মহিলাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তার গর্ভস্থ ভ্রূণটি ত্রিশূল দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। পরে সুপ্রিম কোর্টকে সিট জানিয়েছিল ঘটনাটি মনগড়া এবং সিডিটি জাল। তা সত্ত্বেও মমতা ব্যানার্জি এবং বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীরা নীরব ছিলেন।

এবার আসা যাক কাবুলিওয়ালার বাঙ্গালি বউ সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, যিনি ২৪.২.১৯৯৭ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে লিখেছিলেন ২০.২.৯৭ তারিখে আলিপুর নোটারি এফিডেফিট বলে আমি জানবাজ খানের স্ত্রী হইলাম। তাঁর জীবনের পরিণতি সুবিদিত। তিনি ওখানে মরুভূমির তপ্ত বালুর নীচে চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। এতেও কিন্তু হিন্দু মহিলাদের কোনও শিক্ষা হয়নি। শুধু কেরালার ৩২ হাজার যুবতীই নয়, মোদীর রাজ্য গুজরাটেও গত ৫ বছরে ৪০ হাজার মহিলা নিখোঁজ, এটাই সর্বভারতীয় মহিলা পাচারের প্রতিচ্ছবি। এই মহিলারা কোথায় যায়? এদের মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে পাচার করে দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে সুস্মিতা ব্যানার্জির বইগুলি পড়ে দেখতে পারেন। তিনি লিখেছেন অসংখ্য বাঙ্গালি হিন্দু মেয়ে আফগানিস্তানে মুসলমানদের ঘরে তৃতীয় চতুর্থ স্ত্রী হয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করে চলেছে। সেখানে মুসলমানদের মধ্যে মুথা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলমানরা ওখানে চাকরি করতে গেলে ২/৩ বছরের জন্য ভিসা পায়। তারা পরিবার নিয়ে যেতে পারে না, তাই তাদের মুথা বিবাহের (ক্ষণস্থায়ী বিবাহের) ব্যবস্থা চালু আছে।

ওখানে তারা একটা বিবাহ করে নেয়। সন্তান হলে তাদের এতিম খানায় পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ভিসার মেয়াদ শেষ হলে দেশে ফেরার সময় ওই স্ত্রীদের তালাক দিয়ে চলে আসে। যতদিন যৌবন থাকে ততদিন দালাল মারফত আবার একটা শাদি করে নেয়। আর

বৃদ্ধ বয়সে কালো বোরখা পরে রাস্তার ধারে বসে আল্লা হো আকবর আল্লা হো আকবর জিগির করতে বাধ্য করা হয়। হজযাত্রীরা ছোয়াবের লোভে তাদের প্রচুর টাকা পয়সা দেয়। ওই সব টাকা কিন্তু তারা পায় না। ধর্ম ব্যবসায়ীরা ওই অর্থ আত্মসাৎ করে। আর ইন্তেকাল হলে স্থান হয় আরবের তপ্ত বালুকার নীচে। শুধু ভারতের মেয়েরা নয় বাংলাদেশের মেয়েরাও ওই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। ফেস বুকে তাদের নগ্ন ছবি মাঝে মাঝে দেখা যায়। নারীপাচারের এই ব্যবসা যে শুধু মধ্য প্রাচ্যে হয় তা নয়। আমাদের ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এর ভালো বাজার রয়েছে। প্রতি বছর এই ব্যবসায় কোটি কোটি টাকার কারবার চলে। এসব এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চোখে পড়ে না।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

ঠিক কী চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন সব বিরোধী দলকে এক ছাতার তলায় এনে নরেন্দ্র মোদীর দলকে পরাজিত করে নিজে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসতে। এর জন্য যা কিছু করতে হয় তাও করতে প্রস্তুত। সে সোজা পথে হোক বা অন্ধকার রাস্তা ধরে হোক। তার কাছে স্বার্থ সিদ্ধিই আসল। মমতা ব্যানার্জি জাতীয় দল ও আঞ্চলিক দলগুলিকে দুভাবে বোঝাচ্ছেন। মুখে সমন্বয়ের কথা বলে ভিতরে ভিতরে বিভেদের বিষাক্ত বাতাবরণ তৈরি করছেন। অবশ্য তার এই শিল্পকলা জাতীয় ও আঞ্চলিক দলের প্রধানরা সবাই জানে। এই যে এবারের ইদের রেড রোডের জমায়েতের মুসলমানদের প্রার্থনা সভাকে তার ভোট ব্যাংকের সভায় পরিণত করে বললেন, 'কিছুতেই এনআরসি করতে দেব না।' তিনি মুসলমান সমাজকে রুখে দাঁড়াতে বললেন। মুসলমানদের সব ভোট তার দরকার তাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন। এটা সফল হলেই এই রাজ্যে কংগ্রেস ও সিপিআইএম-কে জব্দ করা যাবে।

গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রায় নিরানব্বই শতাংশ মুসলমান ভোট পেয়েছিল। হিন্দু ভোট তারা পাঁচ-ছয় শতাংশ পেয়েছে মাত্র। তাতেই বিধানসভায় ২০২১-এ কংগ্রেস ও সিপিআইএম শূন্য আসন লাভ করে। মুসলমান ভোট যত একমুখী হবে হিন্দু ভোট ততটাই একমুখী হতে বাধ্য। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশাসনের কারণেই হয়েছে। তার শাসনে হিন্দু সমাজ আক্রান্ত হলে কংগ্রেস ও বাম দলগুলো চোখ বন্ধ করে থাকে। কিছুই তাদের চোখে পড়ে না। চতুর মমতা ভালো করে জানেন বরাবরের মতো কিছুতেই কংগ্রেস ও বাম দলগুলো হিন্দু সমাজের পাশে দাঁড়াবে না। এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়ো প্রাপ্তি। আর বিজেপি বিরোধী দুই জাতীয় দল কংগ্রেস ও সিপিআইএমের সর্বনাশ। এ সুযোগ কিছুতেই মমতা হাতছাড়া করবে না। তাইতো রামনবমীর শোভাযাত্রায় ইট, পাথর, কাচের বোতল ও বোমা পড়লেও বিজেপি বিরোধী দুই জাতীয় দল কংগ্রেস ও সিপিআইএম নীরব থাকে।

সংসদে বিজেপির পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হলো জাতীয় কংগ্রেস। রাহুল গান্ধী তাদের প্রধান মুখ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই আঞ্চলিক দলগুলিকে বোঝান তারা কিছুতেই রাহুল গান্ধীকে নেতা হিসেবে মানবে না। অবশ্য ডিএমকে মমতার কথা মানেনি। বিগত চারটে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ঠিকমতো দাগ কাটতে না পারায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক দলগুলিকে বোঝায় তারা যেন কিছুতেই রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে না মানে। এদিকে দুর্নীতির ও রাহুলের অসংলগ্ন কথার কারণে তার সাংসদ পদ হারিয়ে কংগ্রেসের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যায়। একপ্রকার বাধ্য হয়েই রাহুল ঘোষণা করেন তিনি আর বিরোধী দলের নেতৃত্বে থাকবেন না। তৃণমূল সুপ্রিমো তো এটাই চাইছিলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়ে লালকৃষ্ণ আদবানি, অটলবিহারী বাজপেয়ী ও মুরলী মোনহর জোশীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁরাও তাকে কন্যা স্নেহে সুপরামর্শ দেন। পরে প্রমোদ মহাজনের সহায়তায় মমতা তার দল নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করেন। পরে ভারত সরকারের রেলমন্ত্রী হন। আজ যে নীতীশ কুমার কলকাতায় এসে বিরোধী জোট তৈরি করতে আসছেন সেই নীতীশ কুমার রেলমন্ত্রী না হতে পেরেই কুপিত হন। আজ তা ইতিহাস হলেও প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার নিয়ে লড়াই ওদের দুজনার মধ্যে লেগেই আছে।

আজ নরেন্দ্র মোদী বিশ্বনেতা। জনপ্রিয়তার বিচারে তিনি বিশ্বের এক নম্বর নেতা। আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানরা মোদীজীর থেকে অনেক পিছনে। দুর্নীতিগ্রস্ত, জামিনে থাকা বিরোধী নেতারা বিলক্ষণ জানেন নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের রামধনু জোটের লড়াই হবে অসম। এই লড়াই ধর্ম ও অধর্মের লড়াই। কৌরবদের মতো বহু দল নিয়ে লড়াই সহজ নয়। তাই ওরা এক একটি দল তাদের মতো করে মানুষকে ভুল বোঝাতে লেগেছে। রাহুল গান্ধী জেতার জন্য বিদেশের মাটিকে বেছে নিয়েছেন। সেখানে তিনি দেশের বদনাম করে মোদীজীর গায়ে কালি ছেটানো শুরু করে দেন। আর মমতা সমেত বাকি বিরোধীরা মুসলমানদের মনে বিদ্বেষ ছড়ানো শুরু করেছে। এরা জেহাদিদের ভোটের লোভে প্রশ্রয় দেয়। এরা মুসলমানদের জাতীয় মূল স্রোতে মিশতে না দিয়ে তাদের শুধু ভোটার করে রেখেছে। বিজেপি সবাইকে নিয়ে চলতে চায়। আস্তে আস্তে ইসলামি সুধীজন আসল সত্য বুঝতে পারছেন। তাই বিরোধীরা আর বেশি দিন আগুন নিয়ে খেলতে পারবে না।

দেশবাসী এখন অধীর আগ্রহে দুর্নীতিগ্রস্ত জামিনে থাকা নেতাদের জেলযাত্রা দেখার অপেক্ষায় রয়েছে।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

জীবনচর্যাজনিত অসুখে নারী

প্রীতি বসু

প্রত্যন্ত গ্রামের গৃহকর্ত্রী ছিয়ানব্বই বছরের বৃদ্ধা ত্রিনয়নীদেবী দেখলেন তাঁর তিপান্ন বছরের জ্যেষ্ঠা কন্যা শেফালি শহর থেকে মোটরগাড়ি করে পিতৃগৃহে এসেছে। তাঁর স্থূলকায় মেয়ে ঘেমে-নেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনো মতে গাড়ি থেকে নেমেছে। ত্রিনয়নীদেবী তরতরিয়ে হেঁটে এসে মেয়ের হাত ধরে নিয়ে চললেন। মেয়ের কষ্টে হৃদয়ে আঘাত পেলেও হেসে হেসে বললেন— 'আমরা তো সেকেলে মা, তোমরা আজকের দিনের মেয়েরা আধুনিক হতে হতে শরীরটাকেই যে নষ্ট করে ফেললে। সেবার জামাই-বাবা এসেছিল, তার শরীরের হালও তো দেখলাম তোমার মতোই। নাতি-নাতনি দুটো এসেছিল— তাদের শরীরের হালও তো তোমাদের মতোই হয়ে উঠছে।'

সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে উপরোক্ত ছবিই সেকেলে ও আধুনিক জীবনযাত্রার পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ফলাফল।

খুব ভালোভাবেই মনে আছে স্বাস্থ্য সম্পর্কে বইয়ের প্রথম পাতার প্রথম লাইনেই লেখা ছিল— 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'— এই কথাটি চিরায়ত সত্য। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে মানুষ সুস্থ থাকতে পারে না। মানুষের স্বাস্থ্যের দু'টি দিক হলো— একটি শারীরিক ও অপরটি মানসিক। এই শরীর ও মনের সুস্বাস্থ্যই একটি মানুষকে রাখে সজীব, প্রাণবন্ত, কর্মচঞ্চল, সুদক্ষ ও সুন্দর।

উপরোক্ত ছবিটিতে দেখা গেছে— তিনটি প্রজন্মের— মা, মেয়ে ও নাতনি— তিনজন নারীর মধ্যে মা সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, কিন্তু মেয়ে ও নাতনি স্বাস্থ্যের অবনতিতে নানান শারীরিক অসুবিধাতে আক্রান্ত।

সেকালের মহিলারা ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে সারাদিন ধরেই ঘর-গৃহস্থালির নানান কাজকর্ম সেরে কাটিয়ে দিতেন। কায়িক পরিশ্রম তাঁদের যথেষ্টই করতে হতো। তার মধ্যেও পরস্পর গল্পগুজব করে বা সময়ে পুজো,খেলা বা

সিনেমা-থিয়েটার দেখে আনন্দ উপভোগ করতেন। শিশুকন্যারা লেখাপড়াও করতো, আবার মুক্ত পরিবেশে খেলা-ধুলোও করতো। অতি চাপে জর্জরিত ছিল না।

কালের নিয়মে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। গ্রাম্যজীবনের শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশ রাজনীতি-সহ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত ভোগ্যপণ্যের আঁচে পড়ে বদলে যাচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান তার প্রযুক্তিজাল সর্বত্রই ছড়িয়ে দিয়েছে। এটি আগে ছিল শুধুমাত্র শহরেই, কিন্তু আজ গ্রামেও টিভি, ফ্রিজ, মোবাইল প্রভৃতি ভোগ্যপণ্যের স্রোত ঢুকে পড়েছে। ফলে মানুষের জীবন আয় বাড়ানোর নেশায় ব্যস্ত থেকে ব্যস্ততম হয়ে পড়েছে। এককথায় মানুষও যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে।

যান্ত্রিক সভ্যতা ও ভোগবাদী জীবন এখন এগিয়ে চলেছে আরও উন্নতি, আরও আরামের উৎস সন্ধানে। আত্মসুখের নেশায় বিভোর মানুষের পক্ষে এখন আর বেশি সময় নিয়ে আত্মিক সম্পর্ক নির্মাণ, হৃদয়ের মিলন, প্রেমপ্রীতির বন্ধনে আটকে থাকা বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সময় যাপনের অবকাশ পাওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। যার ফলে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সম্পর্কের সেতু ক্রমশই আলগা হয়ে পড়ছে। শ্রমশক্তি, মেধা বেহিসেবি ভাবে খরচ করে চলেছে। মদ, হেরোইন, গুটখা প্রভৃতি নানান বিপজ্জনক নেশায় আক্রান্ত হচ্ছে। ক্ষতিকর সার ও বিষে জর্জরিত খাদ্যশস্য খেয়ে মানুষের স্বাস্থ্য ক্রমবর্ধমান হারে বিপন্ন। মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে 'জীবনচর্যাজনিত' (Life Style Diseases) অসুখে, যথা— স্থূলত্ব উচ্চ রক্তচাপ, সুগার, হার্টের অসুখ, এইচ আই ভি সংক্রমণ প্রভৃতি।

মহিলারাও আজ পুরুষের সঙ্গে সকলকাজেই সমানভাবেই এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু তাঁদের দৈহিক গঠনের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে গিয়ে তাঁরা 'লাইফ-স্টাইল-অসুখ'-এ ভীষণভাবেই আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষভাবে মাতৃত্বকালীন নানান অসুবিধা তাঁদের ঘিরে ধরেছে।

মনে হয় নারীরা একটু সচেতন হলে 'লাইফ- স্টাইল-ডিজিজ' থেকে দূরে থাকতে পারবেন। এজন্য তাঁদের প্রয়োজন মানসিক দৃঢ়তা, খাদ্যাভ্যাসে সংযম, অহেতুক মানসিক জটিলতা সৃষ্টি হতে না দেওয়া, মানবিক সম্পর্কে যত্নশীল থাকা, সর্বোপরি সংযমী আচার-আচরণ পালন করা। □

রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড কমায় কাঁচা লঙ্কা

গবেষক দলের প্রধান ডাঃ টিমোথি বেটসের বক্তব্য, ক্যানসার আক্রান্তদের খাবারদাবারে অবশ্যই লঙ্কা থাকা উচিত। ক্যানসার রোগীরা তাতে ব্যাপক উপকৃত হবেন। ধূমপান করেন যাঁরা তাঁদেরও নিয়মিত লঙ্কা খাওয়া উচিত, কেননা ফুসফুসে ক্যানসার হওয়া

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

লঙ্কা রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড অর্থাৎ সব ধরনের বাজে চর্বির পরিমাণ কমায়। লঙ্কা পাকস্থলীতে ক্যানসার হওয়া আটকায়। লঙ্কা ডায়াবেটিকদের জন্যও উপকারী। লঙ্কা ভালো ঘুম উপহার দিতে পারে, সাইনাসের নাকবন্ধতা খুলে দিতে পারে। খাওয়ার বিশ মিনিটের মধ্যে লঙ্কা শরীরে তাপ বৃদ্ধি ঘটাতে থাকে। অক্সিজেন আত্মীকরণের গতিও বাড়িয়ে তোলে।

লঙ্কা খেলে অতিরিক্ত ক্যালোরি তথা চর্বি পোড়ে। মুটিয়ে যেতে থাকা এবং মুটিয়ে যাওয়াদের জন্য লঙ্কা তাই খুবই উপকারী। লঙ্কা মেশানো খাবার শরীর দ্রুত আত্মস্থ করতে পারে, কারণ হজমপ্রণালীকে উদ্দীপিত করার মতো উপাদান রয়েছে লঙ্কায়। ফুসফুসে জমে থাকা কফ-শ্লেষ্মা তাড়াতে পারে লঙ্কা। হার্টে রক্ত প্রবাহ বাড়িয়ে তোলে। অনুচক্রিকার ধ্বংস রোধ করে রক্তের তঞ্চন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখে। রক্তবাহী নালিগুলোর সম্প্রসারণশীলতা বাড়িয়ে দিয়ে হাইব্লাড প্রেসারের আধিক্য হ্রাস করে। লঙ্কা খিদেও বাড়ায়। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের প্রদাহ উপশম করে। লঙ্কা অবসাদরোধী।

লঙ্কা যত বেশি ঝাল, তত উপকার। কারণ, উপকারটা করে থাকে লঙ্কা নামক ফলের ডগা থেকে বীজধারের গায়ে সেঁটে থাকা প্ল্যাসেনটা তথা গর্ভনাড়ি সঞ্জাত ক্যাপসাইসিন নামক যৌগ। লঙ্কার ঝাঁঝ কম-বেশি হয় এই ক্যাপসাইসিন যৌগটির পরিমাণের উপর। লঙ্কার ক্যাপসাইসিন গলায় সংক্রমণ ঘটতে দেয় না। এজন্য লতা মঙ্গেশকর মুম্বইয়ে থাকলে কাঁচা কোলাপুরি লঙ্কা খেতেন, বাইরে গেলে সঙ্গে থাকত লঙ্কার গুঁড়ো। খাবারে মিশিয়ে খেতেন। আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিকাল নিউট্রিশনে অস্ট্রেলিয়ার গবেষকরা জানিয়েছেন, খাবারে নিয়মিত লঙ্কা খেলে ইনসুলিনের চাহিদা অনেকটাই কমে যায়। তাই টাইপ টু

ডায়াবেটিসে যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের খাবারদাবারে লঙ্কা থাকা উপকারী।

লঙ্কার মাধ্যমে রক্তে সুগারের মাত্রা হ্রাস পেয়ে থাকে। ক্যাপসাইসিন ছাড়াও লঙ্কায় থাকা ভিটামিন সি, খাদ্যআঁশ, ক্যারোটিনয়েড তথা ভিটামিন এ এক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়ে থাকে। লঙ্কায় প্রচুর খাদ্যআঁশ থাকে। লঙ্কা খেলে পাকস্থলীতে ক্যানসার হয়, ধারণাটা ভুল। ঘটনা হলো, লঙ্কা পাকস্থলীতে আলসার তথা ক্ষত হওয়া আটকায়; ক্ষতের বাড়বৃদ্ধি রোধ করে পাকস্থলীর প্রাচীরকে সুরক্ষা দেয়, পাকস্থলীর কোষকলাকে পুনর্নির্মাণ করে। তবে এটা ঠিক, প্রচুর পরিমাণে লঙ্কা খেলে পাকস্থলীর ক্ষতি হবে। যে কোনও জিনিসই নিয়মিত বেশি খেলে শরীরের কোনও না কোনও ক্ষতি হয়।

অন্যদিকে, ইউনির্ভাসিটি অব নটিংহামের গবেষকদের দাবি, ক্যানসার ছড়ায় যে টিউমার কোষ, লঙ্কায় থাকা ক্যাপসাইসিন তাদের ভাতে মারে। বেঁচে থাকার জন্য যে উৎস থেকে শক্তি পাচ্ছিল ওরা, সেই উৎসকে সরাসরি আক্রমণ করে ক্যাপসাইসিন। এই আটকানোরও ক্ষমতা আছে লঙ্কায়। পাকস্থলীর নিকটবর্তী প্যাংক্রিয়াস তথা অগ্ন্যাশয়ে ক্যানসার হওয়া আটকাতে পারে লঙ্কা। প্রস্টেট গ্ল্যান্ড থেকে মূত্রথলিতে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়াও রুখতে পারে।

ইউনির্ভাসিটি অব পিটস্বার্গ-এর স্কুল অব মেডিসিনের ফার্মাকোলজি বিভাগের অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর ড. সঞ্জয় শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, লঙ্কা ডিম্বাশয়ে ক্যানসার হওয়াও আটকাতে পারে। লঙ্কা খেলে ভালো ঘুম হয়, জানিয়েছেন ইউনির্ভাসিটি অব তাসমানিয়ার গবেষকরা। লনসেস্টনে ১৮ মাস ধরে মানুষের উপর লঙ্কার ঘুম উন্নতিকারক গুণ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাঁরা। দিনে ১৫ গ্রাম করে লঙ্কা খাইয়ে এই ফল পাওয়া গিয়েছে। লঙ্কার প্রভাবে ঘুম যখন ভালো হয়, তখন হার্টও চাঙ্গা থাকে।

উল্লেখ্য, ১০০ গ্রাম কাঁচালঙ্কায় প্রোটিন থাকে ২.৯ গ্রাম। খনিজ পদার্থ এক গ্রাম। খাদ্যআঁশ ৬.৮ গ্রাম। কার্বোহাইড্রেড ৩১.৬ গ্রাম। ক্যালসিয়াম ১৬০ মিলিগ্রাম। □

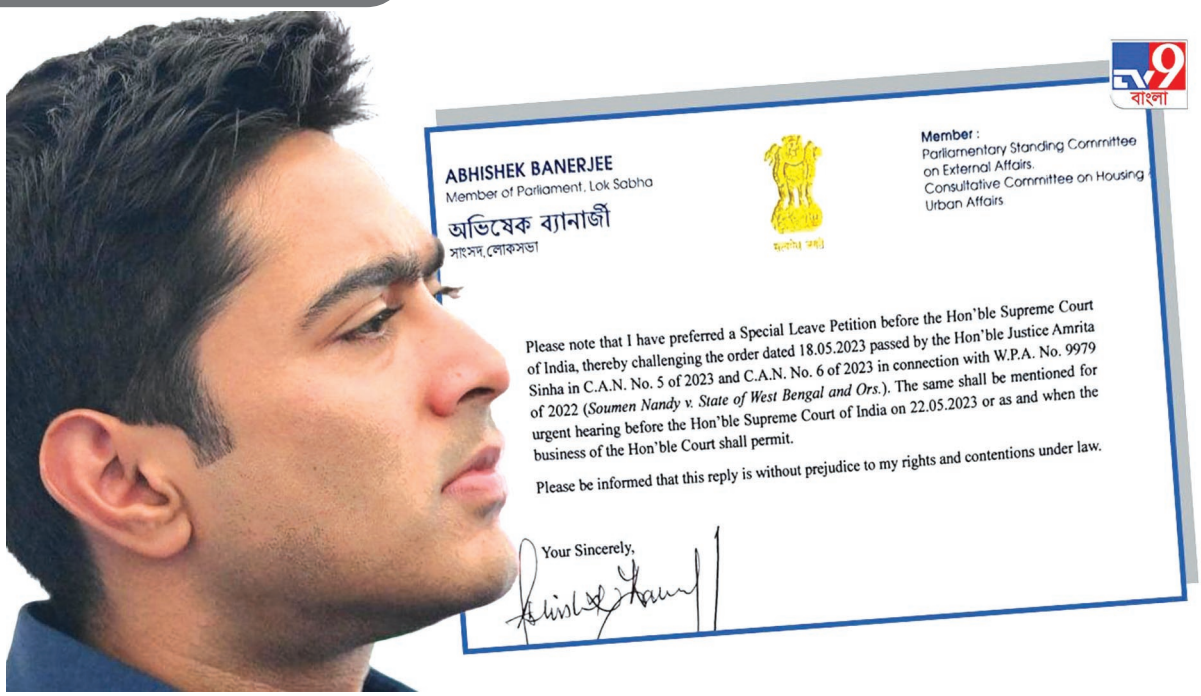

তদন্ত এড়ানোর জন্য উচ্চ আদালতে করা আবেদনপত্র।

তদন্তের জেরা এড়িয়ে কোথায় পালাতে চাইছেন অভিষেক

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

বঙ্কিমের হরিদাসী বৈষ্ণবী (বিষবৃক্ষ) গান ধরত—

'কাঁটা বনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল,
গো সখি কাল কলঙ্কেরি ফুল...।'

তদন্ত প্রক্রিয়া অনেকের কাছেই যেন সেই কাঁটার মাঠ। যার খোঁচায় সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়, কলঙ্ক আবিষ্কার হয়। তাই সেই কাঁটার মাঠ অনেকেই অপছন্দ করে। যেমন অভিষেক ব্যানার্জি। একজন নেতার পোটেনসিয়াল এফেক্ট কী থেকে বোঝা যায়? প্রথম এবং শেষ উত্তর হবে নির্ভীকতা। চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন শোনার সাহস। উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা। কথায় আছে 'It is not power that corrupts, but fear. Fear of losing power corrupts those who weild it...' ভয় পেয়েছেন অভিষেক? নীতিহীন এক দল তৃণমূল, তার ওপর নিজের বলে কিছুই করেননি। সবটাই যেন মুখে সোনার চামচ নিয়ে অবতারণা। কাল কী হবে। দলটা আদৌ টিকবে তো! এই ভয় বা বলা উচিত কনফিডেন্সের ঘাটতি সবসময়ই তৃণমলের। তাই যা পাও লুট করার মন্ত্রে ওরা চলে। দুর্নীতির সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ধরেই নিলাম, অভিষেক ব্যানার্জি এখনও সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন না, তীরে বসেই দুর্নীতির মেগা শো উপভোগ করছেন— তবে তো তাঁর সাহসী নেতার মতো আচরণ করা উচিত।

তার উপর আবার তৃমমূলের নবজোয়ার কর্মসূচি চলছে। তা তো পরিচ্ছন্ন জলের জোয়ার নিশ্চয়ই? তবে তো আরও বেশি করে অভিষেকের চোর ধরার বিষয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে সহযোগিতা করা দরকার। না হলে যে নবজোয়ারে বেনো জল বিপুল পরিমাণে থেকেই যাবে। কেন তিনি তদন্ত প্রক্রিয়ার নাম শুনলেই প্রতিক্রিয়াশীল হচ্ছেন! এ যে ভীরুতার লক্ষণ। যা স্বঘোষিত 'জননেতা' উপাধির সঙ্গে চূড়ান্ত বেমানান। অভিষেককে আর্থিক অসংগতিপূর্ণ নানান বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি জেরা করতে চায়। যা অতি স্বাভাবিক এক প্রক্রিয়া। কিন্তু অর্থ ব্যয় করে কপিল সিব্বাল এবং অভিষেক মনু সিংভির মতো দুঁদে আইনজীবীর শরণাপন্ন হয়ে বার বার পাঁকাল মাছের মতো তদন্তের জেরা এড়াতে চাইছেন। কখনও কোভিড পরিস্থিতির দোহাই তো কখনও নবজোয়ারের বাহানা দেখিয়ে তদন্তে প্রক্রিয়ার জিজ্ঞাসাবাদ পর্বের থেকে পাশ কাটাতে চাইছেন বারবার। জেরা এড়াতে তিনি মরিয়া, ফলে সুপ্রিম কোর্টের দরজায় কড়া নেড়েছেন বারে বারে। তিনি বার বার স্থগিতাদেশের আবেদন করছেন।

ইতিপূর্বে ২০২২-এর মে মাসে ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় কয়লাকাণ্ডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি (এনফোরসমেন্ট ডাইরেক্টোরেট)-কে নির্দেশ দেন, তদন্তকারী সংস্থা যেন অভিষেককে কলকাতাতেই জেরা করে। এবং ইডি যেন অভিষেক এবং তাঁর স্ত্রী রুজিরাকে নির্বিঘ্নে জেরা করতে পারে সেই বন্দোবস্ত করতেও রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছিল

শীর্ষ আদালত। এমনকী এও বলা হয়েছিল, দরকারে ইডি আধিকারিকদের সুরক্ষা দেবে কলকাতা পুলিশ। তারপরেও যতবার কয়লা কিংবা কুন্তলের চাকরি লুটের বিষয়ে কলকাতাতেই অভিষেককে জেরার জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছে তরবারই তিনি জেরা আটকাতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এবারটা আর শেষ রক্ষা হলো না। কুন্তল, যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার মূল খল চরিত্র, যে ধৃত হওয়ার পরই তৃণমূল বেমালুম না চেনার ভান করছে। যুব তৃণমূলের সদস্য, নেতা এবং অভিষেক ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অভিষেক ব্যানার্জি বলছেন, 'কে কুন্তল'! সেই অভিষেক অনুগামী যুব তৃণমূলের কুন্তল গত ৩১ মার্চ আলিপুরের বিশেষ আদালতের বিচারক এবং কলকাতা পুলিশের হেস্টিংস থানায় চিঠি দিয়ে দাবি করেন সিবিআই এবং ইডি তাকে চাপ দিয়ে অভিষেকের নাম বলিয়ে নিতে চাইছে। কুন্তলের এই বয়ান খতিয়ে দেখতেই অভিষেককে জেরার জন্য সমন পাঠানো হয়। তাতে তিনি এত বিচলিত কেন! তিনি দেশের শীর্ষ ন্যায়ালয় পর্যন্ত দৌড়ালেন স্থগিতাদেশ নেওয়ার জন্য। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। ২০ মে শনিবার, অভিষেক ব্যানার্জিকে প্রায় সাড়ে ন' ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। তারপর থেকেই অদ্ভুত সব আচরণ তৃণমলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

কাকতালীয় ভাবে এই ২০ মে-তেই মমতা ব্যানার্জির ২০১১-তে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অভিষেকের দিন। মমতা ব্যানার্জিও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠলেন টুইটারে। তিনি দাবি করছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্সি-রাজ তাদের কাজকে চ্যালেঞ্জিং করে তুললেও সারা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের সঙ্গে আছে। কিন্তু মমতা ব্যানার্জির থেকে এই প্রতিক্রিয়া কাম্য নয়। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এই মমতাই তো জর্জ ফার্নান্ডেজের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগেই সততার প্রতীক হয়ে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছিলেন। তবে আজ রাজধর্মে এত শঙ্কিত কেন? আজ কেলেঙ্কারিতে নিজের পরিবারের নাম বারবার উঠে আসছে বলেই কি উলটোসুরে গাইতে হচ্ছে! পাবলিক সিমপ্যাথি

সস্ত্রীক অভিষেক

অভিষেক নিজেকে স্বতন্ত্র বীর রাজনীতিকে পরিগণিত করতে চান। কিন্তু পুনঃ পুনঃ জেরা এড়িয়ে তিনি পক্ষান্তরে দুর্নীতির প্রতি দুর্বলতাই প্রদর্শন করছেন। তদন্ত এড়িয়ে চলাকে তিনি মহিমা হিসেবে প্রদর্শন করলেও আদতে তা সত্য প্রকাশ্যে না আনার দুর্জয় প্রয়াস।

নেওয়ার উদ্দেশ্যে পালটা অভিযোগের আঙুল উঠছে ইডি- সিবিআই-এর দিকে। মমতা বলছেন, অভিষেককে আটকালে আমি রাস্তায় নামব। আবার এই মমতাই বলেন— আইন আইনের মতো চলবে। জিজ্ঞাসাবাদের পর বিরক্ত অসন্তুষ্ট অভিষেক বলে উঠলেন, 'সময় নষ্ট'।

কিন্তু তিনি কি ভুলে যাচ্ছেন, যে কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় তিনি বারবার আইনি রক্ষা কবচ নিচ্ছেন, সেই কংগ্রেসেরই রাহুল গান্ধীকে ২০২২-এর ২০ জুন ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় ১৪ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এবং ১৩-১৫ জুনের মধ্যেই তিনি মোট ২৭ ঘণ্টা জেরার সম্মুখীন হন। গান্ধী পরিবার এবং কালীঘাটের ব্যানার্জি পরিবারের রাজনৈতিক দল পরিচালনা করার ধরন এক হলেও, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে অতি প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া যে 'ঠাকুর ঘরে কে আমি তো কলা খাইনি' হয়ে যায়— তা বোঝার পরিপক্কতা কংগ্রেসের থাকলেও ওর থেকেই জন্ম নেওয়া অস্থির রাজনৈতিক দল তৃণমূলের তা নেই। কংগ্রেসের অশোক গেহলট থেকে মল্লিকার্জুন খাড়গে কিংবা কে সি বেনুগোপাল সবাই সিবিআই এবং ইডির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তা বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি বলা ভালো। এও বলা যায় চোরের মায়ের বড়ো গলা।

কিন্তু অভিষেক এমন একটা আচরণ করছেন— যেন এই জিজ্ঞাসাবাদের ফলে নব জোয়ারে এতটাই ক্ষতি হলো যা অপূরণীয়। সবটাই দৃষ্টি আকর্ষণ এবং নিজের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির কৌশল। তার সঙ্গে তো অবশ্যই রয়েছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার ও বিষোদ্গার। যা তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রথম এবং শেষ অ্যাজেন্ডা। তারা এমন ভঙ্গিমায় অপপ্রচার চালান যেন ইডি কিংবা সিবিআই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মতো রাজনৈতিক ক্যাডার। অভিষেকের মনে রাখা উচিত, সমস্ত তদন্ত, জিজ্ঞাসাবাদ এবং জেরা প্রক্রিয়া চলছে কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে। যদি কোনো অবস্থায় সত্যিই অভিষেকের মনে হয়, ইডি তদন্তের নামে তাঁর সময় নষ্ট করছে, সে কথা রাজনৈতিক মঞ্চে না বলে আইনি প্রক্রিয়াতেই বলতে পারেন তো! ন্যায়ালয় বিচার করবে কার অভিযোগ ঠিক।

এই তো ক'দিন আগেই একই ঘটনা ছত্তিশগড়ে হলো। ছত্তিশগড় সরকার ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে ইডি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে তারা 'running amonk', অথচ ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ২০০০ কোটির লিকুইয়ার স্ক্যামে জর্জরিত। তাওতো আদালত তাদের অভিযোগের ভিত্তি খতিয়ে দেখলেন। তাদেরও পক্ষের আইনজীবী ছিলেন কপিল

নিরুপায় অভিষেক সিবিআই অফিসে হাজিরা দিতে চলেছেন।

সিব্বাল! ইডির উদ্দেশে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বার্তা ছিল— কোনো ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে না। তাই তৃণমূল যখন এই প্রচার চালায়— কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি ভারতীয় জনতা পার্টির অঙ্গুলিহেলনে চলে, তা অপদার্থতারই নামান্তর। তা নিজেদের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি মামলায় কুন্তল ঘোষের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে যখন হাইকোর্ট প্রথমে জানাল ইডি এবং সিবিআই অভিষেককে জেরা করতে পারবে, তখন তো অভিষেকের উপর জরিমানাও ধার্য হলো ২৫ লক্ষ টাকা। জেরা এড়াতে এক তো আদালতে আবেদন যার কোনো সারবত্তা নেই তার ওপর 'ছোট্ট' ফাইন। সেই ২৫ লক্ষ (অভিষেক এবং কুন্তল উভয়েই ২৫ লক্ষ; মোট ৫০ লক্ষ টাকা) ফাইনেও হলো না; পুনরায় আবেদন ছুটল সুপ্রিম কোর্টে; যা উল্লিখিত।

অথচ ২০১৯-এর নির্বাচনী হলফনামায় উল্লেখ ছিল তাঁর হাতে নগদের পরিমাণ ৯২ হাজার ৫০০ টাকা। স্ত্রী রুজিরার কাছে ছিল ৮৭ হাজার ৩০০ টাকা। অভিষেকের নামে ব্যাংকে গচ্ছিত ছিল ৬৮ লক্ষ ৫০ হাজার ৭৩৯.৪৫ টাকা। এবং স্ত্রীর নামে ১২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬১৫ টাকা। তাদের কোনো স্থাবর সম্পত্তি নেই। গাড়িও নেই! তবে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (দু' বছরে) হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট মিলিয়ে যে ৩৩০ কোটি টাকা ব্যয় হলো, তা কোন গৌরী সেন দিলেন! উত্তর এটাই ২৯২ কোটি টাকা এসেছে কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা চুরি করে। এবং অবশিষ্ট ৩৮ কোটি টাকা তৃণমূলের ইলেকট্রোলার বন্ড থেকে মেটোনো হয়েছে। তাই জনগণের প্রাপ্ত টাকার এও একরকম লুট। লুট করা অর্থে যুবরাজ আইনি বিলাসিতাটাও দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন। এ অবশ্য অভিষেকের চিরকালীন অভ্যাস। গত ২৯ মার্চ শহিদ মিনারে যে রাজনৈতিক সমাবেশ হলো, সে ব্যয়ও চুরি করেছিল রাজ্য সরকারের তহবিল থেকেই। রাজনৈতিক এক কর্মসূচি কিন্তু তা সাজানোর খরচ এসেছে রাজ্য কোষাগার থেকে। পূর্ত দপ্তরের তরফ থেকে রীতিমতো টেন্ডার দিয়ে শহিদ মিনার ময়দানকে সমাবেশের জন্য সাজিয়ে তোলা হয়। পূর্ত দপ্তর সূত্রের খবর, এই সভার জন্য সরকারের ব্যয় আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা। এর আগেও আমলা আলাপন মামলায় বিপুল অর্থ ব্যয় করেছে নবান্ন। তখনও সরকারি কোষাগার থেকেই অভিষেক মনু সিংভিকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১-এ ২৫ লক্ষ টাকা ফিজ দেওয়া হয়। অভিষেকের তদন্ত পালিয়ে এড়িয়ে বেড়ানোর জেরে আরও একটু জেরবার রাজ্য কোষাগার। আর্থিক তছরুপের মামলায় অনেক রথী মহারথীরাও তদন্ত এবং আইনের কাছে মাথা নত করেছে। পি চিদাম্বরম থেকে শুরু করে ইন্দিরা গান্ধী কেউই এড়াতে পারেননি শাহ কমিশন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য আর কে ধাওয়ান পুরনো ঘটনা স্মরণে বলেছিলেন 'I remember Indiraji left for appearing before Shah Commission from her Willington Crescent residence just like any other day...' রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হলেও এই রাজনৈতিক মেজাজ নিঃসন্দেহে অনুসরণীয়। অভিষেক নিজেকে বাঘ বলেন, আরও নানান ভাষণে নিজেকে স্বতন্ত্র বীর রাজনীতিকে পরিগণিত করতে চান। কিন্তু পুনঃ পুনঃ জেরা এড়িয়ে তিনি পক্ষান্তরে দুর্নীতির প্রতি দুর্বলতাই প্রদর্শন করছেন। তদন্ত এড়িয়ে চলাকে তিনি মহিমা হিসেবে প্রদর্শন করলেও আদতে তা সত্য প্রকাশ্যে না আনার দুর্জয় প্রয়াস। ■

সেঙ্গল উজ্জ্বল ভারতের প্রতীক

সরোজ চক্রবর্তী

সেঙ্গল হলো উজ্জ্বল ভারতের প্রতীক। দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্মারক। সেঙ্গল ভারতের স্বাধীনতা, সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতীক। সেঙ্গল হলো একটি ধর্মদণ্ড— যা ঐশ্বরিক ও নৈতিক শাসনের প্রতীক। সেঙ্গল হলো কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। এটি হলো স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করা হয়েছিল এবং একটি স্বাধীন জাতি হওয়ার সঙ্গে যে দায়িত্বটা আসে তার একটি স্মারক।

সেঙ্গল খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি। এটি প্রায় ১৮ ইঞ্চি লম্বা। এটি নানান নকশা নিয়ে সজ্জিত এবং উপরে একটি নন্দীর (ষাঁড়) মূর্তি রয়েছে। হিন্দুধর্মে নন্দী বা ষাঁড় একটি পবিত্র প্রাণী এবং একে শক্তি ও শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। তাই সেঙ্গল হলো ভারতবর্ষের শক্তির প্রতীক। সমস্ত ভারতীয়দের জন্য গর্বের উৎস। সেঙ্গল শব্দটি তামিল সেম্মৈ শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো ন্যায় বা ধার্মিকতা এবং কোল যার অর্থ লাঠি বা যষ্ঠি। সেঙ্গল হলো একটি ঐতিহাসিক সোনার রাজদণ্ড বা ধর্মদণ্ড। প্রাচীন তামিল গ্রন্থে সেঙ্গল বলতে রাজার বা রাজশক্তি নৈতিক শাসনের প্রতীককেই বোঝানো হয়েছে।

এই সেঙ্গলটি ব্রিটিশরাজ থেকে মুক্তি এবং স্বাধীন ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতীক হিসেবে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে নেহরুর কাছে মাউন্টব্যাটনের জিজ্ঞাস্য ছিল, ভারত স্বাধীনতা অর্জন করলে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতীক কী হবে? নেহরু বিষয়টি নিয়ে দেশের শেষ গভর্নর জেনারেল সি রাজা গোপালাচারীর সঙ্গে আলোচনা করেন। সি রাজাগোপালাচারী তামিল পরিবারের সন্তান হওয়ায় তিনি নেহরুকে তামিলনাড়ুর রাজপরিবারের ঐতিহ্যের বিষয়ে বলেন। তিনি জানান, প্রথা অনুযায়ী রাজপরিবারের নতুন রাজার অভিষেকের সময় হাতে রাজদণ্ড তুলে দেওয়া হয়। এই প্রথার সূত্রপাত চোল রাজাদের শাসনকাল থেকে হয়েছিল। রাজাগোপালাচারী নেহরুকে ব্রিটিশদের হাত থেকে সেই রাজদণ্ড নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এক্ষেত্রে নেহরু ঐতিহাসিক রাজদণ্ডটি জোগাড় করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন রাজাগোপালাচারীকেই। এই রাজদণ্ডটি তৈরির জন্য তামিলনাড়ুর মঠ তিরুভাদুথুরাই আধিনাম-এর গুরু রাজদণ্ড তৈরি করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিরুভাদুথুরাই আধিনাম মঠ আবার সেই রাজদণ্ড তৈরির দায়িত্ব তৎকালীন মাদ্রাজের এক প্রখ্যাত জহুরি ভুম্মিডি বঙ্গারু চেট্টির হাতে তুলে দিয়েছিল। এই রাজদণ্ড সেঙ্গল তৈরি করার পর বঙ্গারু তা মঠের কাছে হস্তান্তর করেন। মঠের এক প্রবীণ পুরোহিত রাজদণ্ডটি মাউন্টব্যাটনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। রাজদণ্ড সেঙ্গল গঙ্গাজল ছিটিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতের মিনিট পনেরো আগে নেহরুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। নেহরুর রাজদণ্ড গ্রহণ করার মুহূর্তের কথা মাথায় রেখে

একটি বিশেষ গান রচনা করা হয়েছিল এবং নির্দিষ্ট সময়ে গানটি পরিবেশিত হয়েছিল।

ভারতের ইতিহাসে সেঙ্গল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীন হওয়ার সময় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতীক হিসেবে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর হাতে এই সেঙ্গল তুলে দেওয়া হয়েছিল। তামিল রাজপরিবারের ক্ষমতা হস্তান্তরের ঐতিহ্য মেনে নতুন রাজার অভিষেকের সময় এই রাজদণ্ড তুলে দেওয়া হতো। চোলবংশের রাজাদের শাসনকাল থেকে এই নিয়ম চালু ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার পর থেকে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের মিউজিয়ামে রাখা ছিল এই সেঙ্গল। মোদীজীর প্রধানমন্ত্রিত্বে সেঙ্গল তার হৃতসম্মান ও গৌরব ফিরে পেল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর তৈরি হলো নতুন সংসদ ভবন। সেই সংসদ ভবনে ন্যায়ের প্রতীক লোকসভার স্পিকারের বসার জায়গার পাশেই স্থাপন করা হলো সেঙ্গল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে ২০২৩ সালের ২৮ মে রবিবার উদ্‌বোধন হলো নতুন সংসদ ভবনের। একই সঙ্গে সংসদ ভবনে স্থাপন করা হলো ঐতিহাসিক সেঙ্গল। ২৭ মে শনিবার রাতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে সেঙ্গল তুলে দেন তামিলনাড়ুর আধিনামের সন্তরা। ২৮ মে রবিবার সকালে সংসদ ভবন উদ্‌বোধনের জন্য যে বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানেই সেঙ্গলটি রাখা ছিল। পুজোর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেঙ্গল নিয়ে নতুন সংসদ ভবনের ভিতরে প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। সংসদ ভবনে লোকসভা কক্ষে স্পিকারের বসার জায়গার পাশেই সেঙ্গল স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী।

জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুরোধেই নতুন সংসদ ভবনের ভিডিয়োয় ভয়েস ওভার বা কণ্ঠ দিয়েছেন সুপারস্টার শাহরুখ খান। শুধু শাহরুখই নন, একই সঙ্গে অপর আরেকটি ভিডিয়োয় কণ্ঠ দিয়েছেন সুপারস্টার অক্ষয় কুমারও। দুই বলিউড তারকা নতুন সংসদ ভবনের ভিডিয়ো শেয়ার করেন, সেখানে তাঁরা কণ্ঠ দিয়েছেন। তাঁদের ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপরে বলিউডের অন্যান্য তারকা ও রাজনৈতিক নেতারাও এই টুইট শেয়ার করেন। টুইটের ক্যাপশনে শাহরুখ লেখেন, 'আমাদের সংবিধানকে যারা তুলে ধরে রেখেছেন, যারা এই মহান দেশের নাগকিদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাদের জন্য কী অসাধারণ নতুন বাড়ি। নতুন সংসদ ভবন আমাদের আশা প্রত্যাশার নতুন ঠিকানা। ১৪০ কোটি ভারতীয়দের এক পরিবারে পরিণত করেছে যে সংবিধান, তাকে তুলে ধরার দায়িত্ব রয়েছে যাদের কাঁধে, তাদের জন্য নতুন নীড় এটি।

বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী পূজা দিয়ে শুরু হয় নতুন ভারতের নতুন সংসদ ভবনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানেই সেঙ্গলকে অমৃতকালের জাতীয় প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেঙ্গলকে সংসদভবনে রাখার স্বপক্ষে দলের বিরুদ্ধে গিয়ে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর টুইটে জানান, 'সেঙ্গল রাজদণ্ডটি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের একটি ঐতিহ্যগত প্রতীক। এটি লোকসভায় স্থাপন করে ভারত নিশ্চিত করছে যে সার্বভৌমত্ব সেখানে কায়েম আছে। সরকার সঠিকভাবে যুক্তি দিচ্ছে, যে রাজদণ্ড পবিত্র সার্বভৌমত্ব এবং ধর্মের শাসনকে মূর্ত করে ঐতিহ্যের ধারাবহিকতাকে নির্দেশ করে।'

নতুন সংসদ ভবনের উদ্‌বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, সংসদ ভবনে পবিত্র সেঙ্গল স্থাপন করা হয়েছে। চোল সাম্রাজ্যে এই সেঙ্গল ন্যায়, সুশাসন ও সততার প্রতীক ছিল। নাম না করে নেহরু ভিয়ান লেগেসিকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সৌভাগ্য যে আজ পবিত্র সেঙ্গলের গরিমা ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। সংসদে যখন অধিবেশন চলবে, এই সেঙ্গলই আমাদের প্রেরণা জোগাবে।□

বারুদের স্তূপের ওপর পশ্চিমবঙ্গ

তরুণ কুমার পণ্ডিত

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক বাজি তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণে বেশ কিছু মানুষের মৃত্যু আবার এই রাজ্যের প্রশাসনকে বারুদের স্তূপের মধ্যে ঠেলে দিল। যেভাবে বিস্ফোরণে মৃতদেহগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে এবং ঘরের চাল উড়ে গেছে তাতে বাজি তৈরির আড়ালে বোমা তৈরি হচ্ছিল কিনা তা তদন্ত করা দরকার। যদিও এই রাজ্যে পুলিশের নাকের ডগায় দোকানে বিস্ফোরক দ্রব্য মজুত থাকে এবং থানার মাধ্যমে বেআইনি কারবারিদের কাছ থেকে তোলা আদায় করে তা উপরের নেতাদের কাছে মাসে মাসে পাঠানো হয় তা আজ মানুষের কাছে ওপেন সিক্রেট হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্য পুলিশকে আর কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না, বরঞ্চ বিচার ব্যবস্থাই মানুষকে কিছুটা ভরসা দিচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা বলে এ রাজ্যে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। প্রকাশ্যে দিনদুপুরে মানুষ খুন এখন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে পড়েছে। আবার যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে একটি সিনেমা দেখবে, সেখানেও বাধা।

যদিও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 'দ্য কেরালা স্টোরি' সিনেমাটি পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে বহাল রইলো। যেখানে সারা ভারতবর্ষে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে দেখানো বারণ নয়, সেখানে এই রাজ্যে ছবিটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে, এটাই স্বাভাবিক এবং সবার জানাই ছিল। তবে কেন তড়িঘড়ি মুখ্যমন্ত্রী সিনেমাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন? ছবিটির পুনর্বহালের নির্দেশ কি বিচার ব্যবস্থার দ্বারা শাসক দলকে সপাটে থাপ্পড় দেওয়া হলো না? আসলে ইদানীং আমাদের রাজ্য সরকারের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত ও স্লোগান দেশের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ, তোষণ, স্বজনপোষণ ও ভোটব্যাংকের রাজনীতি এই রাজ্যের হিন্দুদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে বলে অনেকেই মনে করছেন। প্রথমত, দ্য কেরালা স্টোরি ছবিতে জেহাদিরা ধর্ম পরিবর্তন করিয়ে এদেশের মহিলাদের কেবলমাত্র জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করছে তাই নয়, তাদের রাষ্ট্রবিরোধী ও ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী করে তুলেছে।

দ্বিতীয়ত, রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, মহিলাদের নিরাপত্তার অভাব এবং বিএসএফের প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। যার ফলে হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে বাবাকে ব্যাগে করে সন্তানের মৃতদেহ লুকিয়ে বাসে করে নিয়ে যেতে হচ্ছে। কিছুদিন আগের এই অমানবিক ঘটনা দেখে রাজ্যের মানুষ শিউরে উঠেছিল। এছাড়াও মালদা থেকে কালিয়াগঞ্জ পর্যন্ত তিন জেলায় লাভ জিহাদের শিকার বেশ কিছু সংখ্যক নাবালিকার অকাল মৃত্যুর বিচার, দাড়িভিটে দুই ছাত্রের পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনা, কালিয়াগঞ্জে মৃত্যুঞ্জয় বর্মণের মৃত্যু, রামনবমীর শোভাযাত্রায় পরিকল্পিত হামলা-সহ এতগুলো বিচারের ভার সিআইডি-র হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এনআইএ ও সিবিআইয়ের ওপর ন্যস্ত হওয়ায় রাজ্য প্রশাসনের ব্যর্থতা এবং কারচুপি ন্যায়ালয়ের বিচারকদের কাছে ধরা পড়েছে।

প্রসঙ্গত, কালিয়াগঞ্জে যে পুলিশ অফিসার মোয়াজ্জেম হোসেন রাতের অন্ধকারে মৃত্যুঞ্জয় বর্মণকে গুলি করে মেরে ফেলেছেন, তিনি মিথ্যা আহত হওয়ার ভান করে হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও আসলে এই হত্যার পেছনে তার হিন্দু বিদ্বেষী মানসিকতা কাজ করেছে। মৃত্যুঞ্জয় বর্মণের স্ত্রী গৌরী বর্মণ আগে একজন মুসলমান ছিলেন এবং বিয়ে করার সময়ে থানায় কেস হয়। সেই কেসের তদন্ত অফিসার ছিলেন এই মোয়াজ্জেম হোসেন। তখন থেকেই তিনি মৃত্যুঞ্জয়ের কোনো দোষ খুঁজছিলেন। কালিয়াগঞ্জে থানা ভাঙচুরের পর সেই সুযোগ হাতে পেয়েই মোয়াজ্জেম এই মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটান বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। মালদার মোথাবাড়িতে দু'বছর আগে জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত দুই হিন্দু ভাইয়ের বিচারও কোর্টের নির্দেশে সিবিআই ও এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানা গেছে।

তৃতীয়ত, শাসক দলের প্রচ্ছন্ন মদতে সন্ত্রাসী ও অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা এরাজ্যে অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে এবং তাদের রাজনৈতিক ভাবে অতি সহজেই জাল আধার কার্ড, প্যান কার্ড ও ভোটার কার্ড করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রদান করে এ রাজ্যকে চরম সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ভিনদেশ থেকে এইরকম বহু অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও জিহাদিদের মুক্তাঞ্চল এই পশ্চিমবঙ্গে মাঝে মধ্যেই আলকায়দার মতো ভয়ংকর জঙ্গিরা ধরা পড়ছে। সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের প্রতি মহামান্য রাজ্যপালের নিরপেক্ষভাবে কর্তব্য পালনের বার্তা শাসকদলের বিভেদের রাজনীতির প্রতি কঠোর মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হচ্ছে।

শাসক দলের নেতা-নেত্রীদের কণ্ঠে বাংলাদেশের ধার করা 'জয়বাংলা' স্লোগানটি এ রাজ্যের মানুষের কাছে এক অশুভ সংকেত বহন করছে বলে কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মনে করছেন। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের সময় বাংলাদেশ থেকে চলে আসা নির্যাতিত এ রাজ্যের মানুষের ধারণা, এই স্লোগানের মাধ্যমে বর্তমান রাজ্য সরকার তাঁদের ১৯৪৭ ও ৭১ সালের সেই যন্ত্রণাময় দেশভাগের স্মৃতি ভুলিয়ে দিতে চাইছেন। এই জন্যই শাসকদলের পশ্চিমবঙ্গকে বার বার 'বাংলা' নামকরণ করার আপ্রাণ চেষ্টার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য ১৯০৫ সালে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করে ইংরেজদের দুরভিসন্ধি ভেস্তে দিয়েছিলেন। সেই সময় দেশের মানুষকে জাগ্রত করতে তিনি নানান কর্মসুচি নিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন এই দেশ মৃন্ময়ী নয়, চিন্ময়ী। দেশ বিভাজনের কষ্ট তিনি অনুভব করেননি, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের কষ্ট তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত সেই বাংলাকে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ করা হলেও তোষণের সেই রাজনীতি এখনও চলছে।

পশ্চিমবঙ্গের নাম পালটে 'বাংলা' করার মধ্যে দিয়ে আত্মবিস্মৃত হিন্দুদের সেকুলার করার এক অপচেষ্টা মাত্র। সারা দেশের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই 'জয়বাংলা' এই ধ্বনি শোনা যায়। অন্য প্রদেশ তো এমনটা করে না। এটা কি সংকীর্ণ চিন্তাধারার প্রতিফলন নয়? আমাদের এই বঙ্গের মনীষীরা কেউ তাদের রচনায় শুধু বাংলা নিয়েই গান, গল্প, প্রবন্ধ লেখেননি, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভারতকেন্দ্রিক ছিল। শাসকদলের নেতারা কি 'জয়বাংলা' না বলে 'জয় পশ্চিমবঙ্গ' বলতে পারেন না? জাতীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাষ্ট্রগানে তো কেবল বঙ্গ নয়, সারা দেশের কথা রয়েছে। সুতরাং জয়বাংলা বলে বাঙ্গালির দেশভাগের যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। কোনও দেশ বা জাতি তার যন্ত্রণার ইতিহাস কখনও ভোলে না। ইজরায়েল, আর্মেনিয়া, স্পেন কেউ ভোলেনি। আজ বাঙ্গালির চিন্তাভাবনা এবং এ রাজ্যের বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহে বিভীষিকাময় সেই দেশভাগের যন্ত্রণা স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠছে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবির সেই সতর্কবার্তা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য— 'সেদিন আমরা একত্র হইনি— আজও নয়'। কত বিপদ গিয়েছে, কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরি, তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে বলেই মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে।' ■

মহারাণা প্রতাপ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

কলকাতা রাজস্থান পরিষদ এবং ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজের যৌথ উদ্যোগে গত ২২ মে সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের সম্মুখস্থিত (চিত্তরঞ্জন এভিনিউ এবং মহারাণা প্রতাপ সরণী ক্রসিং) বড়ো মূর্তির পাদদেশে স্বাধীনতার পূজারি মহারাণা প্রতাপ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শেক্সপিয়ার সরণীস্থিত মহারাণা প্রতাপ উদ্যানে মহারাণার মূর্তিতে মাল্য দান করা হয়। সেখানে রাজস্থান পরিষদের মহামন্ত্রী অরুণপ্রকাশ মল্লাবত উদাত্তকণ্ঠে মহারাণা প্রতাপের বীরগাথা সংবলিত কবিতা পাঠ করেন। বড়ো মূর্তি পাদদেশে জমায়েতে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থান পরিষদের অধ্যক্ষ শার্দুল সিংহ জৈন, মহামন্ত্রী অরুণপ্রকাশ মল্লবত, ভাগীরথ সারস্বত, বালকৃষ্ণ মাহেশ্বরী, রামাকিশন কাসট, শ্যামসুন্দর কাবরা, বিজয় বিয়ানী এবং হরি রতন চাণ্ডক।

অখিল ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সংরক্ষক জয়প্রকাশ সিংহ, মহামন্ত্রী শঙ্কর বক্স সিংহ, গুড্ডন সিংহ, শ্রীপ্রকাশ সিংহ, কমলেশ সিংহ, কৃষ্ণা সিংহ এবং গৌতম সিংহরায়। অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অরুণ প্রকাশ মল্লাবত।

ট্রাক ড্রাইভার মজদুর সঙ্ঘের রাজ্য সম্মেলন

গত ২১ মে আগরতলা টাউন হলে ত্রিপুরা ট্রাক ড্রাইভার মজদুর সঙ্ঘের তৃতীয় দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরাম সিংহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই রাজ্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি প্রেসিডেন্ট রাজীব ভট্টাচার্য। সম্মেলনে পরবর্তী তিন বছরের জন্য একুশ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বলাইনাথ চৌধুরী এবং সেক্রেটারি হিসেবে অরুণাভ (রজত) দত্তকে মনোনীত করা হয়। সম্মেলনে বিএমএসের অখিল ভারতীয় কার্যকরী সদস্য শ্রীমতী রুমা সাহা, ত্রিপুরা প্রদেশ সেক্রেটারি তপন কুমার দে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাপতি উত্তম সরকার এবং সেক্রেটারি বাবুল ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সার্বিক বিষয়ে আলোচনা হয় এবং আগামী কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়।

শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

বীরভূমের বিশিষ্ট সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধার উদ্যোগে গত ২১ মে বীরভূম জেলার পানুরিয়া গ্রামের নব্বই বছর বয়স্ক মুক্তিপদ মণ্ডল মহাশয়কে তাঁরই ভদ্রাসনে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক নিমাই চন্দ্র মণ্ডল। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী রূপা ঘোষাল। শ্রীমণ্ডল মহাশয়ের বড়ো পুত্রবধূ তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের পদধৌত করে পূজা করেন। শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। দুটি বালিকা স্বস্তিকা মণ্ডল ও তিথি পাল গান পরিবেশন করে। শ্রীমণ্ডল মহাশয়কে নামাবলী, ধুতি, ফল , মিষ্টি ও শ্রীগীতা দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। মানপত্র পাঠ করেন অবসরপ্রাপ্ত পোস্টাল সুপারিনটেনডেন্ট আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। পরিবারের পক্ষ থেকে জ্যেষ্ঠপুত্র রত্নাকর মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। গ্রামের সমাজসেবক নির্মল চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক দামোদর ঘোষাল।

ধর্মজিজ্ঞাসা—দশ

কর্মফলেই মানুষ পায় আনন্দ ও যন্ত্রণা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

তিনি দণ্ডদাতা। তিনি সুফলদাতা। দুটি ক্ষেত্রেই সমান নিরপেক্ষ তিনি। যিনি যেমন কর্ম করেন, তিনি তেমনই ফল পান তাঁর হাত থেকে। আর ঠিক এই কারণেই তিনি একইসঙ্গে রয়েছেন ভয় ও ভক্তির আসনে। মানুষ তাঁর আরাধনা করেন একই সঙ্গে তাঁর ক্রোধ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আবার তাঁর কৃপা পাওয়ার জন্যও। কেবল মানুষ নয়, দেবতারাও তাঁর ক্রোধের দৃষ্টির বাইরে থাকার জন্য থাকেন সদা তৎপর। তিনি রবিনন্দন শনিদেব। সম্ভবত তিনিই একমাত্র দেবতা যাঁর নাম উচ্চারণে সবরকম বিচ্যুতি এড়াতে সাধারণ মানুষ তাঁকে বড়ঠাকুর বলে ডেকে থাকেন।

সূর্যপুত্র শনিদেব। তিনি সকলকে সমান দৃষ্টিতেই দেখেন। অন্যায় যদি কেউ করেন, অপরাধ যদি কারও হয়, তাহলে তিনি যদি আপনজনও হন, অথবা পূজনীয়, শ্রদ্ধেয় কেউও হন, তাহলেও তাঁর ক্রোধের নজর থেকে রেহাই পান না তিনি। আর তাই পিতা হয়ে সূর্যও ভয় পান তাঁকে।

ব্যাপারটা প্রথম থেকে বলাই ভালো। ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞা। ত্বষ্টা বিয়ে দিয়েছিলেন তাকে সূর্যের সঙ্গেই। চলছিল সব কিছু ভালোই। তাদের তিনটি ছেলে-মেয়েও হয়। কিন্তু সূর্যের প্রচণ্ড তেজ সহ্য করতে পারেন না সংজ্ঞা।

একসময় সেই তেজ অসহ্য হওয়ায় গৃহত্যাগ করেন সংজ্ঞা। অবশ্য কিছুটা ছলনার আশ্রয় নেন তিনি। সূর্যকে কিছু জানাননি সংজ্ঞা। বরং তাঁকে কিছুটা বিভ্রান্ত করতে তৈরি করেন তাঁরই অনুরূপ এক মূর্তি। সংজ্ঞার ছায়ামূর্তি— তাই নাম হলো তাঁর ছায়া। ছায়াকে সূর্যালয়ে রেখে সংজ্ঞা চলে যান বাবার কাছে। কিন্তু বাবা তাঁকে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে বলেন। সংজ্ঞা স্বামীকে খুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু সূর্যের প্রচণ্ড তেজ তাঁর সেই ভালোবাসাকে পুড়িয়ে যেন খাক করে দেয়। তাই মন চাইলেও তাঁর কাছে যান না সংজ্ঞা। বরং নির্জনে বসে তপস্যা করতে থাকেন। প্রার্থনা একটাই, স্বামীর তেজ যেন কিছুটা কমে— তিনি যেন স্বামীর তেজকে সহ্য করতে পারেন।

এদিকে সূর্যগৃহে সংজ্ঞারূপী ছায়া কিন্তু খুব সুখেই ঘর সংসার করছিলেন। সূর্যও বুঝতে পারেননি যে ছায়া প্রকৃত সংজ্ঞা নন। তাই তিনিও স্বাভাবিকভাবেই মিলিত হতেন তাঁর সঙ্গে। সূর্যের ভালোবাসায় ছায়া ক্রমেই বিগলিত। তিনি ক্রমে নিজেকেই সংজ্ঞা ভেবে কর্তৃত্ব করতে শুরু করেন। এমনকী সংজ্ঞা যাওয়ার আগে বারবার তাঁর তিন সন্তানকে স্নেহমমতায় ভরিয়ে দেখাশোনা করার যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সে কথাও ভুলে যান। তাদের লালন পালন করা দূরে থাক, তিনি তাঁদের অবহেলাই করতে থাকেন। এতে ক্রমেই ক্ষুব্ধ হতে থাকে সংজ্ঞার সন্তানরা— বিশেষ করে যম।

ওদিকে সূর্যের সঙ্গে মিলনে ছায়া গর্ভবতী হন। ছায়ার মধ্যে জেগে ওঠে প্রকৃত মাতৃত্ব। ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনায় খোলা আকাশের নীচে বসে তিনি তপস্যা করতে থাকেন আরাধ্য মহাদেবের। ওই অবস্থায় সূর্যের প্রচণ্ড তাপে ছায়ার গর্ভস্থ সন্তান পুড়ে একবারে কালো হয়ে যায়। আর সেটাই হয়ে দাঁড়ায় ছায়ার সন্তান এবং সূর্যের পক্ষে এক মহাসংকটের কারণ।

পুত্রের কালো রং দেখে সূর্য একবারে ক্ষিপ্ত। তাকে সন্তান বলে মানতে অস্বীকার করেন তিনি। একই সঙ্গে ছায়াকেও নানা কুকথা বলতে থাকেন সূর্য। মায়ের এই অপমানে নবজাতক শনিদেব হন ভয়ানক ক্রুদ্ধ। তীব্রভাবে তাকান তিনি সূর্যের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সূর্যও কৃষ্ণ বর্ণ হন। গ্রহণ লাগে ঠিক সেই মুহূর্তেই। এভাবে নিজের উজ্জ্বল বর্ণ হারিয়ে কালো হয়ে ওঠায় বিমর্ষ হন সূর্য। শনিদেবকে কিছুতেই তাই ভালো চোখে দেখতে পারেননি তিনি।

ছায়া ছিলেন মহাদেবের ভক্ত। তাই নিয়মিতই তিনি মহাদেবের বিশেষ পূজা করতেন। সেদিনও সেই পূজারই

আয়োজন করছিলেন তিনি। নৈবেদ্য ও পূজার নানা উপচার সাজাচ্ছিলেন তিনি। এমন সময় সেখানে আসেন শনিদেব। পূজার আগেই তিনি নৈবেদ্য থেকে ফল তুলে নেন খাবার জন্য। ছায়া তাঁকে বাধা দেন। বলেন, দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত নৈবেদ্য পূজা শেষের আগে খেতে নেই।

মায়ের একথায় রেগে যান শনিদেব। মুহূর্তের জন্য বুঝি হারিয়ে ফেলেন হিতাহিত জ্ঞান। মাকে তিনি লাথি মারেন। ছেলের এমন অনুচিত ব্যবহারে ছায়াও রেগে যান। শনিদেব যে তাঁর ছেলে একথাও বুঝি ভুলে যান। আর তাই অভিশাপ দেন, যে পায়ে তুই আমাকে লাথি মারলি তোর সেই পা বিকৃত হবে। খোঁড়া হয়ে থাকবি তুই।

মুহূর্তের রাগ শনিদেবের জীবনে আনল এক বিপর্যয়। তিনি চিরকালের মতো খঞ্জ হয়ে গেলেন। তবে যে মহাদেবের পূজাকে কেন্দ্র করে এমন ঘটনা ঘটল, তিনিই এবার এগিয়ে এলেন পুরো ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্য। শনিদেবকে বলেন, যে অপরাধ তুমি করেছো তার ফল তোমাকেই ভুগতে হবে। আজীবন তুমি খোঁড়া হয়েই থাকবে। তবে তুমিই হবে সকলের কর্মফল দাতা। প্রত্যেকের প্রতিটি কাজ তুমি লক্ষ্য করবে নিবিড় ভাবে। তারপর সেই কাজের সঠিক বিচার করে তুমি তার ফল দেবে সকলকে। এই কাজ করার জন্য তোমার হবে বক্রদৃষ্টি। তারই ফলে সকলের সবকিছু দেখতে পারবে তুমি।

কেবল এটুকু নয়, পিতা সূর্যের সঙ্গে শনিদেবের যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল তাও দূর করে দেন মহাদেব। পিতা-পুত্রের মিলন ঘটান তিনি।

শনিদেবকে বলা হয় কৃষ্ণের অবতার। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেন, গ্রহদের মধ্যে তিনি হলেন শনি। নবগ্রহের অন্যতম শনিদেবকে জ্যোতিষশাস্ত্রে মানুষের শুভাশুভের নিয়ামক বলে মনে করা হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (১০৮/২৪) আছে তাঁর গ্রহ পদ প্রাপ্তির কথা। পুরাণ মতে, তিনি হলেন কর্ম, ন্যায়বিচার ও প্রতিশোধের দেবতা। মানুষের কথা, চিন্তা ও কর্মের বিচার করে তিনি তাদের সেইমতো ফল দিয়ে থাকেন।

শনিদেব দীর্ঘায়ু, দুঃখ, মৃত্যু, জরা ও বার্ধক্য, শৃঙ্খলা, সীমাবদ্ধতা, দায়িত্ব, বিলম্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, নম্রতা, সততা এবং অভিজ্ঞতার সহজাত জ্ঞানের নিয়ন্ত্রক। আধ্যাত্মিক তপস্যা, শৃঙ্খলা এবং বিবেকপূর্ণ কাজেরও প্রতীক তিনি।

মধ্যযুগের কিছু কিছু গ্রন্থে তিনি হলেন দুর্ভাগ্যের অশুভ বাহক। দেবতা হলেও তিনি ওই কারণেই মানুষের ভয়ের কারণ। কিন্তু অন্যান্য নানা গ্রন্থের নানা তত্ত্ব থেকে বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন নিরপেক্ষ দেবতা। যিনি ভালো কাজ করেন তিনি পান তাঁর কৃপা। তার মঙ্গল করেন তিনি। কিন্তু তিনি খারাপের খারাপ। মন্দ কাজ করলে তাঁর দণ্ডের হাত থেকে রেহাই নেই কারও। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের জন্য মানুষের মনে তাঁর সম্পর্কে এক ধরনের ভীতি রয়েছে। বাস্তবে তিনি হলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এক দেবতা। কিন্তু বহু সময়ই ভুল বুঝে অনেকে তাঁর জীবনেও এনেছেন নানা ধরনের অন্ধকার।

শনিদেব ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। প্রায় সব সময় কৃষ্ণধ্যানে ডুবে থাকতেন। সেদিনও তেমনি ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন তিনি। এমন সময় তাঁর কাছে এলেন তাঁর স্ত্রী চিত্ররথ-কন্যা মান্দা। ঋতুস্নান সেরে সন্তান কামনায় তিনি আহ্বান করেন শনিদেবকে। কিন্তু ধ্যানরত শনিদেবের কাছে অশ্রুতই থেকে যায় যে আহ্বান। তিনি স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে আগের মতোই কৃষ্ণমন্ত্র জপ করতে থাকেন তিনি। মান্দা ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বিনী ও সতীসাধ্বী। শনিদেব তাঁর ডাকে সাড়া না দেওয়ায় তাঁর মনে হলো, ইচ্ছে করেই তাঁকে উপেক্ষা করছেন শনিদেব। মুহূর্তে অভিমান পরিণত হলো মহাক্রোধে। তিনি রেগে অভিশাপ দিলেন শনিদেবকে। বললেন, তুমি আমায় অবহেলা করে তাকালে না পর্যন্ত। তাই তুমি যার দিকেই তাকাবে, তারই জীবন ছারখার হয়ে যাবে— ধ্বংস হয়ে যাবে সে।

এক সময় শেষ হয় শনিদেবের তপস্যা। স্ত্রীকে বলেন, তাঁর সাড়া না দেওয়ার কারণটি। শুনে অনুতাপ শুরু হয় মান্দার। সব না বুঝে স্বামীকে অভিশাপ দেওয়ায় তিনি যেন মরমে মরে যান। যে অভিশাপ তিনি দিয়েছেন, তা ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো ক্ষমতা বা উপায় তাঁর নেই। তাই বারবার ক্ষমা চান তিনি শনিদেবের কাছে। আর সেদিন থেকেই শনিদেব মাথা নীচু করে হাঁটেন। তাঁর দৃষ্টিতে কেউ ছারখার হয়ে যাক এটা চান না বলেই শনিদেব সবসময়ই নত মস্তক। এ কাহিনি ব্রহ্মপুরাণের।

পুরাণ মতে শনিদেব হলেন কৃষ্ণ বা নীল বর্ণের দেবতা। তাঁর হাতে রয়েছে তলোয়ার বা রাজদণ্ড। বাহক তাঁর কাক। কোথাও কোথাও আছে তিনি লোহার রথে অধিষ্ঠিত। সে রথে রয়েছে একটি কাক, একটি শকুন এবং আটটি ঘোড়া। কালো বস্ত্র পরিহিত শনিদেবের হাতে ধনুকও দেখা যায় কোনো কোনো মূর্তিতে।

শনিদেব খুবই ধৈর্যশীল ও বুদ্ধিমান। কর্মফল দিতে গিয়ে বহুবার তিনি বহুজনের রোষে পড়েছেন। কিন্তু তার জন্য কোনো সময় সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হননি। প্রসঙ্গত, শনিদেবের মতোই তাঁর অগ্রজ যমও কর্মফল দাতা। অবশ্য তিনি মৃত্যুর ঈশ্বর। মানুষের মৃত্যুর পর তাদের পাপ-পুণ্যের বিচার করে সেই মতো স্বর্গ বা নরকে পাঠান তাদের। অন্যদিকে শনিদেব জীবিত মানুষকে তাদের কর্মফলের জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তি দিয়ে থাকেন। তিনি হলেন সমস্ত মানুষের কর্মফল দাতা। এই কর্মফলের কারণেই মানুষ বাঁধা জন্মান্তরের কাল চক্রে।

হিন্দু ধর্ম দর্শনে ওই কর্মবাদ একটা বিশেষ ভূমিকা নিয়ে চলেছে। সাদা কথায়, কর্মবাদ হলো কিছু নৈতিক বিধি এবং তার কার্যকারিতা সম্পর্কিত মতবাদ। এক কথায়, এর সারমর্ম হলো— যেমন কর্ম তেমন ফল। এই ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় আবার পাওয়া যেতে পারে পরবর্তীকালেও। এখানেই এসে পড়ে জন্মান্তরবাদের বিষয়টি। হিন্দু ধর্মের অন্যতম বক্তব্য, কর্মবাদ একটি অবিচ্ছিন্ন

বহমান ধারা। কর্মের ফল ভোগ করা যায় ইহজন্মেই আবার সেই ফলের প্রভাব পড়ে পরজন্মেও।

পার্থিব জন্ম বা ইহজন্মে একজন যেমন কাজ করবেন তার ফল তাঁকে ভোগ করতে হবে পরের জন্মেও। এই কথাটি বারবার বলা হয়েছে হিন্দু দর্শনে। যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে (৪/৫/৫), আত্মাই ব্রহ্ম। এই আত্মা বিজ্ঞানময় আবার মন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, পৃথিবী, জল, আকাশ বাতাস, কাম-অকাম, ধর্ম ও অধর্মময়ও। অর্থাৎ আত্মা হলো সর্বময়। সসীম ও অসীম দুয়ের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট আত্মা। আবার আত্মা হলো অবিনশ্বর। দেহকে অবলম্বন করেই আত্মা তার পার্থিব প্রকাশ ঘটায় নানা রূপে। একটি আশ্রয় পুরনো হলে অথবা নষ্ট হয়ে গেলে আত্মা অন্য একটি দেহকে অবলম্বন করে। এই যে আশ্রয় বদল তা খানিকটা ভাড়া বাড়ির মতো। মেয়াদ শেষে ভাড়াটেকে খুঁজে নিতে হয় অন্য একটি বাড়ি। পুরনো বাড়ি ছাড়ার সময় সেখানকার সবকিছুই কিন্তু নিয়ে আসা হয় নতুন বাড়িতে। আত্মার দেহ বদলের ক্ষেত্রেও ঘটে তাই।

দেহ বদলের সঙ্গে সঙ্গে আত্মা বয়ে নিয়ে যায় পূর্বজীবন বা আগের দেহে বর্তমান থাকার সময়ের সমস্ত কাজের ফলাফলকেও। কাজের এই ফল ভালো ও মন্দ দু' রকমই হতে পারে। এই ভালো কাজকেই বলা হয় পুণ্য আর মন্দ কাজ হলো পাপ। এক পার্থিব জীবনে যাঁরা ভালো কাজ করেন তাঁরা হলেন পুণ্যবান। পুণ্যবানরা পরজন্মেও ভোগ করেন সেই পুণ্যফল। অন্যদিকে যাঁরা মন্দ কাজ করেন, অসৎপথে চলেন অথবা ধর্মবিরোধী কর্মকাণ্ডে মত্ত থাকেন, তাঁরা হলেন পাপী। এই পাপীরা বর্তমান জন্মেই কোনো না কোনো ভাবে তাঁদের ওই অসৎ কাজকর্মের জন্য নানা দুর্ভোগ বা সংকটে পড়েন, অনেক সময় জীবনটাই দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তাঁদের। কিন্তু তাতেই শেষ হয় না পাপের ফল ভোগ। পরজন্মেও তাঁদের বইতে হয় ওই পাপের ভার। এমনকী ইহজন্মে যাঁরা পাপের ফল ভোগ করেননি বলে ধারণা করা হয়, তাঁরাও পরজন্মে সেই পাপ কাজের দেনা মেটাতে বাধ্য থাকেন। সে কারণেই অনেক সময় দেখা যায়, যে ব্যক্তি আদৌ কোনো খারাপ কাজ করছেন না অথবা সৎ পথেই চলছেন— তাঁর জীবনটাও সুখাবহ হচ্ছে না, একের পর এক অসুবিধা তাঁকে যেন ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এঁদের দেখেই অনেকে প্রশ্ন করেন, এমন ভালো মানুষেরও যদি এমন দশা হয় তাহলে ধর্মাচরণ করে বা সৎ পথে থেকে কী লাভ? অন্যদিকে চোখের সামনে যে নানা অসৎ কর্ম করছে সে তো রয়েছে দিব্যি দুধে-ভাতে। তাহলে?

এই তাহলেরই উত্তর জন্মান্তর বা কর্মবাদ। বিগত জন্মের কাজের ফলেই ব্যক্তির জীবনে দেখা যায় অমন বিপরীত ফল। হিসেবের হালখাতায় যেমন জের টানা হয় আগের বছরের লাভ-লোকসানের, এও অনেকটা সেই রকম। আগের জন্মের কর্মের কারণেই মানবজীবনের অমন বিপরীত এবং বিচিত্র রূপ দেখা যায়। পুণ্যবানরা এই জন্মে খারাপ কাজ করেও হয়তো তার ফল ভোগ করেন না, কিন্তু ফল তাদের ভোগ করতেই হয়। আর সে কারণেই চলতি কথায় বলা হয়, পাপ ছাড়ে না বাপকেও।

একথাটাই বলা হয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদে। সেখানে আছে, যে যেরকম কাজ বা আচরণ করে সে সেই রকমই হয়। শুভ কাজ যাঁরা করেন তাঁরা সাধু হন, অন্যদিকে পাপাচারীরা পাপী হন। মানুষ পুণ্যকর্মের ফলে পুণ্যবান এবং পাপ কাজের ফলে হয় পাপী। অবশ্য অনেকে বলেন, 'পুরুষ হলেন কামময়'। যিনি যেমন কামনা করেন সেইরকম সংকল্প যুক্ত হয়ে সেইরকম কাজই করেন। পাপও সেইরকম ফলই।

কর্মফল ভোগের এমন বিপরীত অবস্থা কেন ঘটে তাও বলা হয়েছে হিন্দু দর্শন শাস্ত্রে। সেখানে কর্মকে আরব্ধ ও অনারব্ধ এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যে কর্মের ফলভোগ শুরু হয়েছে তাকে বলা হয় প্রারব্ধ বা আরব্ধ কর্ম। আর যে কর্মের ফল ভোগ শুরু হয়নি তাকে বলা হয় অনারব্ধ কর্ম। এই অনারব্ধ কর্ম আবার সঞ্চিত ও সঞ্জীয়মান— এই দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি হলো বিগত জন্মের এবং দ্বিতীয়টি বর্তমান জন্মের কর্ম।

তবে ভারতীয় দর্শনেরই অন্যমতে কর্ম সকাম ও নিষ্কাম হতে পারে। সকাম কর্মের জন্য মানুষ ফলভোগ করে আর নিষ্কাম কর্মে শেষ পর্যন্ত মোক্ষ লাভ ঘটে। সকাম কর্ম হলো বিষয়ানুগ— বিষয়ের প্রতি আসক্তি রয়েছে এই কর্মের মূলে। একারণে সকাম কর্মের সাধনায় ফল ভোগের জন্য আবার জন্ম নিতে হয়। আর নিষ্কাম কর্মে থাকে না কোনোরকম বিষয়বাসনা— তাই নিষ্কাম কর্মে পুনর্জন্মের কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

দেবী ভাগবতে রাজা জন্মেজয়কে উপদেশ দিতে গিয়ে ব্যাসদেব বলেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই হলেন কর্মফল দাতা। কর্মফলের মুখ্যপ্রকাশ হলো জন্মে। কর্মফলের জন্যই মানুষকে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পাক থেকে হয় বারবার।

বিভিন্ন পুরাণে কর্মফলদাতা হিসেবে বিভিন্ন জন্মের কথা বলা হয়েছে। যেমন শিবপুরাণে (২/২/৪১) বিশ্বেশ্বর শিবকে সমস্ত কর্মের ফলদাতা হিসেবে বন্দনা করেছেন বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেবতারা।

যাইহোক, হিন্দু ধর্ম দর্শনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কর্মফল এবং জন্মান্তরবাদ। এই দর্শনের মূলকথা, কর্ম বা কাজ প্রত্যেককেই করতে হয়। সেই কাজ যেমন হবে তেমনই পাওয়া যাবে ফল। সেটা কখনও পাওয়া যায় হাতে হাতে, কখনও-বা বেশ কিছু সময় বাদে। যেমন গরমকালেই আম খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করা যাবে তার স্বাদ। আবার কোনো কারণে দূষিত খাদ্য খাওয়া হলে তার ফল পেতে কয়েক ঘণ্টা, এমনকী দিনও লাগতে পারে। একই ভাবে জীবনে যে যে রকম কাজ করে তার ফল সে ভাবেই পায়। এই কর্মফল এমনই একটা বিষয় যার হাত থেকে মানুষ দেবতা অথবা অবতারদেরও রেহাই নেই। বিভিন্ন দর্শন গ্রন্থ তো বটেই, বিভিন্ন পুরাণ, মহাকাব্যেও বলা হয়েছে সেই কথাই। ▫

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি

মাসান ঠাকুর

সুস্মিত চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গের মানুষের, বিশেষ করে রাজবংশী সম্প্রদায়ের কাছে মাসান ঠাকুর এক জনপ্রিয় লৌকিক দেবতা। মাসান ঠাকুরকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ এবং অসমের কিছু ক্ষেত্রে ছড়িয়ে রয়েছে নানা কিংবদন্তী। বিভিন্ন গবেষকদের মান্যতা যে, মাসান ঠাকুর উর্বরতার প্রতীক। নানা লোকগাথা অনুসারে, মাসান ঠাকুর মা কালীর সন্তান। আবার অনেকেই মনে করেন, স্বয়ং শ্মশানচারী দেবাদিদেব মহাদেব নিজেই মাসান ঠাকুরে পরিণত হয়েছেন। ড. গিরিজা শঙ্কর রায়ের মতে, মাসান ঠাকুর কুবেরেরই আরেক রূপ। এই নিয়ে উত্তরবঙ্গে রয়েছে একটি প্রসিদ্ধ লৌকিক কবিতা—

‘নাচিতে নাচিতে কালী আইয়র
চুইয়া পড়ে ঘাম
তাতে সৃষ্টি হইল
এ জন্য মাসান’

অর্থাৎ কবিতা অনুসারে মা কালী থেকেই মাসান ঠাকুরের উৎপত্তি। উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে নানা রকমভাবে মাসান ঠাকুর পূজিত হন। ড. চারুচন্দ্র সান্যাল তার ‘Rajbangshis of North Bengal’ গ্রন্থে ১৬ রকম মাসান ঠাকুরের উল্লেখ করেছেন, যদিও কোচবিহারের একটি ক্ষেত্র সমীক্ষায় ২৪ রকম মাসান ঠাকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মাসান ঠাকুর এক কথায় ভীষণদর্শন। তিনি দণ্ডায়মান অথবা পদ্মাসনে উপবিষ্ট। তার দেহ কৃষ্ণবর্ণ, হাতে ধারণ করেন বিশালাকায় গদা। বাহন কখনো-বা শোল মাছ অথবা কখনো ভেড়া। আগে গ্রামে গঞ্জে থান/পটে মাসান ঠাকুরের পূজা হতো। বর্তমানে মাসান ঠাকুর মন্দিরে মৃন্ময় মূর্তিতে পূজিত হন। যদিও স্থানভেদে মাসান ঠাকুর ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে পূজিত হন।

পুজোতে মাসান ঠাকুরকে সাধারণত দই-চিড়া, আটিয়া কলা, আখের গুড় নিবেদন করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শনি ও মঙ্গলবার পূজা হয়ে থাকে। আবার ভাদ্র মাসে মাসান ঠাকুরের জন্ম বলে অনেক স্থানেই পূজা হয় ভাদ্র মাসে। প্রায় সম্পূর্ণ উত্তরবঙ্গ, নিম্ন অসম, এমনকী নেপালেও মাসান ঠাকুরের অনেক মন্দির ছড়িয়ে আছে। মাসান ঠাকুরের মন্দিরে লাল ধ্বজ (পতাকা) সর্বদা দেখা যায়। কোচবিহারে মাসান ঠাকুরের প্রচুর মন্দির রয়েছে। কোচবিহার জেলার দিনহাটা সংলগ্ন গোসানিমারী এলাকায় ফুলবাড়ি গ্রামে মাসান ঠাকুরের বড়ো মন্দির রয়েছে, যা গড়কাটা মাসন ঠাকুরের মন্দির নামে পরিচিত। সুপ্রাচীন কামতাপুর রাজ্যের কামতেশ্বর রাজার দুর্গ (গড়) ভাঙার সময় এই দেবতা প্রতিষ্ঠিত হন বলে এটি গড়কাটা মাসান মন্দির নামে সুপরিচিত। এখানে বৈশাখ মাসে পুজো ও বিশাল মেলা চলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই পুজো এবং মেলা মোটামুটি ৩০০ বছরের পুরনো। হাজার হাজার ভক্ত মাসান ঠাকুরের কাছে মনস্কামনা নিবেদন করেন। বিভিন্ন রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অনেকে মাসান ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে থাকেন।

মাসান ঠাকুর কোথাও লৌকিক মন্ত্রে এবং কোথাও শাস্ত্রীয় সংস্কৃত মন্ত্রে পূজিত হন। কোচবিহার জেলার লোকসংস্কৃতি ও মাসান ঠাকুরকে কেন্দ্র করে এক দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে, যা বিভিন্ন গবেষণাপত্র থেকে জানা যেতে পারে। মাসান ঠাকুরের প্রতি রয়েছে আমাদের অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। আজ এই তথাকথিত আধুনিক যুগেও, লৌকিক দেবতা মাসান ঠাকুর উত্তরবঙ্গের মানুষ, তাঁর ভক্তদের মনে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভগবান হিসেবে বিরাজমান। ◻

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের এক মহান যুদ্ধ এবং ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা

মলয় দাস

বাঁধাধরা জীবনের বাঁধন আলগা করে ইতিহাসের পথে ভাসতে ভাসতে আমরা পৌঁছবো সুদূর অতীতের এক সন্ধিক্ষণে। মহাকালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া যে সময়ের ঘটনাস্রোত আমরা ফিরে দেখতে চলেছি, যিশুখ্রিস্টের জন্ম তখনও হয়নি। সময়টা ঐতিহাসিকদের মতে আনুমানিক ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। ভৌগোলিক ভারতবর্ষের ধারণা তখনও গড়ে ওঠেনি। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত ছোটোবড়ো অসংখ্য প্রদেশ বা রাজত্বে। শাসনতন্ত্রের নিরিখেও প্রদেশগুলি স্বতন্ত্র। কোথাও বিরাজ করছে কয়েক পুরুষ ধরে চলে আসা রাজবংশের শাসন, কোথাও প্রাচীন কোনও রাজবংশের ক্ষমতার ভার ন্যস্ত প্রজাদের কর্তৃক নির্বাচিত - শাসকের ব্যবস্থাপনায়। ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের সঙ্গে মাথা তুলছে শূদ্রপ্রাধান্য কোনো কোনো অংশে। উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম প্রান্তে রাজনৈতিক অস্থিরতা অত্যন্ত বেশি। চব্বিশটিরও বেশি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর রাজ্য, যারা অবিরাম ব্যস্ত একে অপরকে ক্ষমতাচ্যুত করার অভিপ্রায়ে। এতদ্ভিন্নতা সত্ত্বেও উপমহাদেশের সাবেক জনমানসের অন্তর্নিহিত ধ্যানধারণা ও সাংস্কৃতিক অভিন্নতা অত্যন্ত প্রকট। বিস্তীর্ণ জনপদের অসংখ্য মানুষ প্রদেশের সীমারেখায়, ব্যবহারিক জীবনদর্শন ও আধ্যাত্মিকতায় তারা যেন মিলতে চায় গঙ্গা-যুমনা- সরস্বতীর মতো মহাসঙ্গমে। অন্তরে ব্যাকুলতা, অভিন্নধারায় বয়ে চলা আকাঙ্ক্ষা একযোগে বিকাশের; প্রতিবন্ধক ছোটোবড়ো রাজন্যবর্গের ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং উদাসীনতা। নৃপতিদের উদ্যমহীনতা ও বাস্তববুদ্ধির অভাব বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে শক্তিশালী-উন্নত-অখণ্ড ভারতবর্ষ গঠনে। যুথবদ্ধ সামরিক ও বৌদ্ধিক ক্ষমতা বিকাশের পরিবর্তে আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্ব সমগ্র দেশকে করে তুলছে দুর্বল ও ভঙ্গুর। সনাতন জীবনদর্শন ও ভাবনা কল্লোলিনীরূপে প্রবাহিত হওয়ার পরিবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে, একইসঙ্গে সুযোগ তৈরি হচ্ছে বৈদেশিক শক্তির ভারতে অনুপ্রবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের।

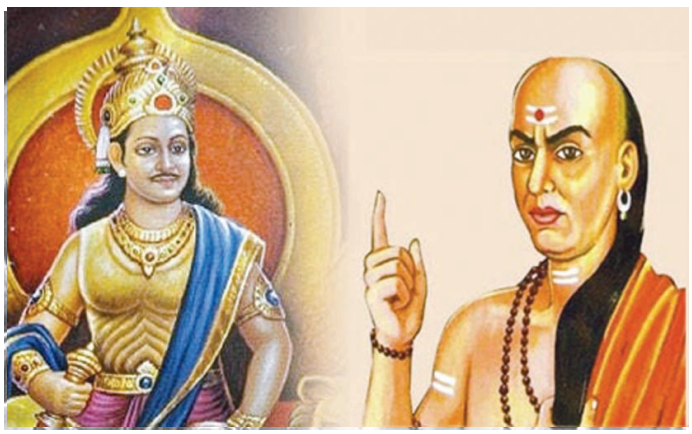

সময়টা ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ইংরেজির মে মাস। বাতাসে উষ্ণতার ছোঁয়া। সূর্যের তাপে দ্বিপ্রহরে জনপদগুলি অনেকটাই শুনশান। ক্লান্ত পথিক ছায়া অন্বেষণে তৎপর। দুর্দম সেই গ্রীষ্মে রাজনৈতিকভাবে অস্থির, অস্থিতিশীল ভারতের প্রবেশদ্বার উত্তর-পশ্চিমাংশে শোনা যায় অশ্বক্ষুরের ধ্বনি। হ্রেষাধ্বনি ক্রমশ তীব্র হতে তীব্রতর হয়। বিশাল সেনানী-সহ ভারতের মাটিতে অনুপ্রবেশ ঘটে দুর্দম, দুর্বিনীত, প্রবল পরাক্রমশালী আলেকজান্ডারের। গ্রিসের ম্যাসিডোনিয়া থেকে ভারতে প্রবেশের পূর্বে এশিয়া মাইনর হতে আফগান পর্যন্ত তৎকালীন এশিয়ার প্রায় সকল সুপ্রসিদ্ধ বৃহৎ সাম্রাজ্য তার দখলে। প্রতিপক্ষ ছিন্নভিন্ন। বিপক্ষের সেনানী শুধু নয়, অধিকৃত নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে আহুতি দেওয়া হয়েছে তরুণ গ্রিক সম্রাটের নরমেধ যজ্ঞে। কোথাও কোথাও সমগ্র নগরী হয়েছে অগ্নিদগ্ধ ও ধূলিসাৎ। চলেছে কেবল লুঠ, সঙ্গে পৈশাচিক নৃশংসতায় নরহত্যা। Jacob Abbott তাঁর 'Alexander the Great' শীর্ষক গ্রন্থে 'The Siege of Tyre' অধ্যায়ে আলেকজান্ডার কর্তৃক টায়ার নগরী আক্রমণ ও ধ্বংসের এক নির্মম ইতিবৃত্ত লিখেছেন। পরাজিত টায়ারবাসীদের নির্বিচারে হত্যা এবং প্রায় দুই সহস্রাধিক মানুষকে ক্রুশবিদ্ধ করার ঘটনায় গায়ে কাঁটা দেয় (পৃ. ১১৯)। গ্রন্থের অন্তিমে তিনি বলেছেন, 'Alexander...was truly great in all those powers and capabilities which can elevate one man above his fellows...though we condemn the selfish and cruel ends to which his life was devoted. He was simply a robber, but yet a robber on so vast a scale, that mankind, in contemplating his career, have generally lost sight of the wickedness of his crimes in their admiration of the enormous magnitude of the scale on which they were perpetrated. (পৃ. ১৯৯)।

দিগ্বিজয়ের প্রতি পদে নৃশংসতার চিহ্ন রেখে আলেকজান্ডার বিপুল সেনানী-সহ প্রবেশ করে ভারতের মাটিতে। দেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের কয়েকজন নৃপতি বশ্যতা স্বীকার করেন তাঁদের রাজ্য আক্রমণের পূর্বেই। কতকগুলি রাজ্য রুখে দাঁড়ায় কিন্তু একযোগে নয়, স্বতন্ত্রভাবে। বিশাল গ্রিক সেনার সমকক্ষ তাঁদের কেউই ছিলেন না। যথাসাধ্য যুদ্ধ করেও এঁরা প্রত্যেকেই পরাস্ত হন এবং উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গ্রিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বিচারে গণহত্যা এখানেও চলে।

বিশেষভাবে ছোটো ছোটো পাহাড়ি স্বাধীনচেতা উপজাতি, যাঁরা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে তাঁদের হত্যা করা হয় (Ancient India---R.C. Majumdar, পৃ. ৯৯-১০১)। ভারত ত্যাগের পূর্বে আলেকজান্ডার বেশ কিছু অঞ্চলে গ্রিক প্রতিনিধি রেখে যায় এবং কিছু অংশে দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট দায়িত্ব দিয়ে যায়, যারা গ্রিক সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত থাকবেন। ভারত হতে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়। অধিকৃত সাম্রাজ্য তাঁর প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে বিভাজিত হয় কম-বেশি দ্বন্দ্বের মাধ্যমে এবং মূলত অধিকৃত পশ্চিম এশীয় সাম্রাজ্যের অধিকারী হয় সেনাপতি সেলুকাস (Seleucus-1 Nicator), যিনি ছিলেন সেলুসিড সাম্রাজ্যের স্থাপতি।

ভারতবর্ষ এই সময়কালে ক্রমশ দ্যুতি হারাচ্ছে। উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম প্রান্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদেশি গ্রিকদের আধিপত্য। মধ্যভারত ও উত্তর ভারতে বিদেশি আক্রমণ শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা অথচ এই অঞ্চলের নৃপতিরা তখনও উদাসীন। তুরস্ক হতে সিন্ধু দেখেছে গ্রিকদের নৃশংসতা। বিগত কয়েক সহস্র বছরব্যাপী ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা ভারতীয় সভ্যতা-সমাজ অবশ্যম্ভাবী আতঙ্কে প্রহর গুণছে। ভয়াল কালবৈশাখী আগমনের পূর্বে যেমন চারিদিক শান্ত থাকে, পক্ষীকুল ভীতসন্তস্ত হয়ে ইতস্তত উড়ে বেড়ায়; আসন্ন মহাপ্রলয়স্বরূপ যবন আক্রমণের আতঙ্কে নিরীহ ভারতীয়গণের অবস্থাও তদানুরূপ। ভারতীয় সভ্যতার উজ্জ্বল সূর্য যেন ধীরে ধীরে চলেছে অস্তাচলে। ভারতবর্ষ যেন পুনরায় এসে দাঁড়িয়েছে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে। কৃষ্ণার্জুনের পুনরাবির্ভাব আজ একান্ত আবশ্যক। আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলায় দুলছে আপামর ভারতবর্ষ। অস্তমিত সূর্য একটু একটু করে ঢলে পড়ছে, তারই সঙ্গে অন্ধকার নেমে আসছে ভারতবর্ষের বুকে। এমন সময় কোথা হতে ভুঁই ফুঁড়ে উদয় হলো অজ্ঞাত কুলশীল এক তেজি ঘোড়সওয়ারের। সদ্য যৌবনে পা রাখা এক যুবক দ্রুত অতি দ্রুত ছুটে চললো অস্তমিত সূর্যের পানে যেন ভারতবর্ষের পড়ন্ত ভাগ্যরবিকে সে চায় পুনরায় উত্তোলনে একেবারে মধ্যগগনে। তেজদীপ্ত সেই পুরুষকে পথ দেখানোর জন্য আবির্ভূত হলেন এক দীপ্ত ব্রাহ্মণ। পরবর্তী ভারতের ইতিহাস বইবে অন্যখাতে। ঔজ্জ্বল্য এবং দীপ্তিতে আলোময় হয়ে উঠবে ভারতের আকাশ। সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়ে দেখবে তেজদীপ্ত এই দুই পুরুষকারের যুগলবন্দি।

দীপ্তিময় ব্রাহ্মণ হলেন কৌটিল্য, যাঁর প্রাজ্ঞতা ও কূটনৈতিক বিচারধারা যেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে মনে করায়। তেজদীপ্ত ঘোড়সওয়ার হলেন স্বয়ং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। চন্দ্রগুপ্তের বংশপরিচয় নিয়ে রয়েছে বিস্তর ধোঁয়াশা। কেউ বলেন, তিনি ছিলেন নন্দরাজ্যের শূদ্রপত্নীর গর্ভজাত সন্তান, অনেকের মতে তিনি ছিলেন জাতিতে শূদ্রবংশীয়, কারোর মতে ক্ষত্রিয়, এরকম আরও বিবিধ মত। বেশকিছু ঐতিহাসিক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সম্ভবত নিম্নবংশীয় বা নিম্নবংশে প্রতিপালিত এমন মনে করেন (The Age of Imperial Unity, সম্পাদিত R.C. Majumdar & A.D. Pusalker পৃ. ৫৫-৫৬)। একপ্রকার অজ্ঞাত কুলশীল হয়েও মন্ত্রী কৌটিল্যের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত ভারতবর্ষের সেদিনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শৌর্য রচনা করেন। আপন ক্ষমতাবলে নিজ সেনা গঠন করেন। অর্থশাস্ত্র মতে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সেনা তৈরি করেছিলেন চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনকারী, ম্লেচ্ছ (কিরাত), ডাকাত দল, অরণ্যবাসী (জনজাতি) এবং ক্ষত্রিয়, এই পাঁচটি শ্রেণী হতে (ঐ, পৃ. ৫৭)। তিনি প্রথমে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল দখল করতে করতে একসময় ভারতের গ্রিক অধিকৃত অঞ্চলে আঘাত হানেন, বাস্তবে যা ছিল গ্রিক আধিপত্য হতে ভারতভূখণ্ডের মুক্তিযুদ্ধ। 'The Age of Imperial Unity'-তে এ প্রসঙ্গে বলছে, ...that Chandragupta had begun the war of liberation, probably in the Lower Sindhu Valley, before 321 BC or even before 323 BC... He arose like the great avenger to whose strong arms 'the earth long harassed by outlanders now turned for protection and refuge. (পৃ. ৫৮-৫৯)

রোমান ঐতিহাসিক Justin-এর লেখায় এ প্রসঙ্গে পাওয়া যায়,

we can accept it as a historical fact that the army of occupation left behind by Alexander was thoroughly defeated by Chandragupta and he made himself master of the Punjab and Sind. (ঐ, পৃ. ৫৯)

চন্দ্রগুপ্ত এরপরেই মগধ আক্রমণ করেন এবং অধিকার করতে সমর্থ হন। এরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মধ্যভারত, উত্তরভারত, পূর্বভারতের ছোটোবড়ো বহু প্রদেশ তিনি সাম্রাজ্যভুক্ত করে এক সুবৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন করেন, সেইসঙ্গে গঠন করেন বিশাল আধুনিক সেনা।

অন্যদিকে সেলুসিড সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সেলুকাস তাঁর বিশাল সেনা নিয়ে উপস্থিত হন গ্রিক সাম্রাজ্য পুনঃরুদ্ধারে। তাঁর বাহিনীতে গ্রিক সেনা ব্যতিরেকেও ছিল অধিকৃত সিরিয়া, পারস্য, আফগান সেনাও। বিশাল সেনানী-সহ তিনি সিন্ধু নদ অতিক্রম করেন, অন্যদিকে অধিকৃত প্রদেশ এবং ভারতবর্ষের সীমা রক্ষায় বিশাল সৈন্য-সহ উপস্থিত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। আলেকজান্ডার তার ভারত বিষয়ে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও উপজাতি এলাকা দখল করেছিলেন। এবারের গ্রিক ও ভারতের সম্মুখ সমর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।, ঐতিহাসিক R.C. Majumdar এই যুদ্ধকে বর্ণনা করেছেন,

'...a fair trial of strength between the Greek and Indian military forces which history has recorded...the generalship of both was as fair a specimen as their countries could normally show.' (Ancient India, পৃ. ১০৫)

বিস্ময়করভাবে আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয় ও যুদ্ধবর্ণনা প্রাচীন গ্রিক ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা যতটা বিস্তারিতভাবে করেছেন চন্দ্রগুপ্ত-সেলুকাস যুদ্ধ সম্পর্কে ঠিক ততটাই নিশ্চুপ। তাঁদের লেখায় উভয়ের মধ্যে চুক্তির বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়েছে। চুক্তি বিষয়ে প্রাচীন গ্রিক ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা যা বলেন তার মর্মার্থ হলো :

'Selucus had abandoned the idea of reconquering the Panjab but had to buy peace by ceding Paropanisadai, Arachosia and Aria, three rich provinces with the cities now known as Kabul, Kandahar and Herat respectively as their capitals and also Gedrosia (Baluchistan)...and Chandragupta made a present of five hundred elephants...' (ঐ)

স্পষ্টতই চুক্তি ভীষণভাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে। এ প্রসঙ্গে ক্ষীণস্বরে হলেও গ্রিক ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা যুদ্ধে সেলুকাসের ব্যর্থতার দিকেই ইঙ্গিত করেন। R.C. Majumdar আরও স্পষ্টভাবে বলেন, 'It is difficult to believe that Seleucus would have readily agreed to part with his rich provinces for such paltry gifts unless he were forced to do so. It is therefore

legitimate to hold that Selucus was worsted in his fight with Chandragupta.' (ঐ)

V.A. Smith তাঁর 'Oxford History of India'-তে স্পষ্টতই সেলুকাসের পরাজয়ের কথা উল্লেখ স্বীকার করেন। তিনি বলছেন,

Seleukos Nikatopr...crossed the Indus to reigning Indian sovereign...The invader was defeated, probably somewhere in the Punjab and compelled to retire beyond the frontier... (পৃ. ৭৪)

এই যুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারেননি। ঐতিহাসিক Dr. V.A. Smith-এর মন্তব্য

'...the triumphant progress of Alexander from the Himalaya to the sea demonstrated the inherent weakness of the greatest Asiatic armies when confronted with Euriopean skill and discipline.'

প্রতিউত্তর স্বরূপ R.C. Majumdar বলেছেন,

'...that the triumph of Chandragupta over Seleucus demonstrateed the inherent weakness of the greatest Hellenic armies when confronted with indian skill and discipline.' (ঐ)

অনেক ঐতিহাসিক, সেলুকাস তাঁর কন্যার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তর বিবাহ দিয়েছিলেন এমন মত প্রকাশ করেন, ঐতিহাসিক Dr. V.A. Smith প্রথমে এই ঘটনার উল্লেখ করলেও এবিষয়ে যথেষ্ট প্রামাণের অভাব আছে বলে পরবর্তী সময়ে মত প্রকাশ করেন। বিবাহ হোক বা না-হোক, বিন্দুসার চন্দ্রগুপ্তের ভারতীয় পত্নীর সন্তান ছিলেন। সেলুকাস তাঁর অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সে সন্ধি করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে তা সেলুসিড সাম্রাজ্যের পক্ষে কার্যকারী হয়েছিল এবং ভারত-গ্রিস সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যে গ্রিকরা কয়েক বছর আগে ভারতের অংশবিশেষ এবং সেই অঞ্চলের নাগরিকদেরকে পদানত করেছিল, চন্দ্রগুপ্তের পরাক্রমে সেই গ্রিকরাই বাধ্য হয়েছিল ভারতবর্ষকে মাথায় করে রাখতে।

মৌর্য সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর উত্তরাংশ, পূর্বে অসম, পশ্চিমে দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চল ও আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্রাট অশোকের সময়ে কলিঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অবশিষ্ট অংশ মূলত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর শাসনকালেই বিস্তার লাভ করে। আক্ষরিক অর্থেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন সম্রাট এবং অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রথম রূপকার। Dr. P. Prabhat ঐতিহাসিক V.A. Smith-কে উদ্ধৃত করে বলেছেন,

The first Indian emperor, more than two thousand years ago, thus entered into possession of that scientivic frontier, sighed for in vain by his English successor and never held in its entirety even by the Mogul monarchs of sixteenth and seventeen. (Hellenistic India and The Mauryan Empire, পৃ. ২)

'Scientific frontier' কথাটি ভীষণ প্রাসঙ্গিক। চন্দ্রগুপ্ত নিছক সাম্রাজ্য বিস্তার করেননি, তিনি বৈদেশিক শক্তির ভারত আক্রমণের যাবতীয় পথ অবরুদ্ধ করে দিয়েছিলেন এবং সেলুকাসকে পরাজিত করার পর মৌর্য শক্তিই ছিল তৎকালীন সময়ে বিশ্বের সর্বপ্রধান শক্তি। একইসঙ্গে একথাও সত্য যে বিজিত রাজ্যের প্রতি কখনই তিনি আলেকজান্ডারের মতো নির্মম ছিলেন না। আলেকজান্ডার সম্পর্কে Royal Military College of Canada এর 'History and War Studies' বিভাগের একজন প্রথিতযশা অধ্যাপক Richard Gabriel 'Alexander the Great : Monster of Macedonia' শীর্ষক প্রবন্ধে বলছেন,

...the man known as Alexander the Great was also one of history's worst monsters. He was a murderous, rage-filled, paranoid, alcoholic... He murdered often, at times indiscriminately. He assassinated rivals a dozen at a time, slaughtered innocents by the thousands and exterminated entire tribes of people.

চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে এমন মূল্যায়ন প্রযোজ্য নয়। তিনি সমাজের নিম্নস্তর হতে উঠে আসা এক আত্মবিশ্বাসী পুরুষ যিনি গগন স্পর্শ করেছিলেন এবং এ কারণেই সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সচেষ্ট হয়েছিলেন তার বাস্তবায়নে। এই মহৎকর্মে তাঁর সহায় ও পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য। ভারতভূমিকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন, আজীবন সংগ্রাম করেছেন এই ভূমির মর্যাদা রক্ষা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায়। সেই প্রচেষ্টার বাস্তবায়নের অন্তে তিনি পুত্র বিন্দুসারকে নিজ স্থলাভিষিক্ত করে জৈনধর্ম প্রভাবিত আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করেন এবং অল্পকাল পর সন্তারা পালন তথা অন্নজল পরিত্যাগ পূর্বক উপবাস পালনের মাধ্যমে দেহত্যাগ করেন। তাঁর কৃতিত্ব আগামী সহস্র বছরের অধিককাল ভারতবর্ষের বুনিয়াদ গঠন ও বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিল। The Age of Imperial Unity-তে বলা হয়েছে,

...for the first time, the political unification of the greater part of India under one sceptre. It was a remarkable achievement, specially when we remember that Chandragupta did not inherit a throne, but was born in humble circumstances. Chandragupta's rise to greatness is indeed a romance of history. (পৃ. ৫৪-৫৫)

ভারতীয় রাজতন্ত্রে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রয়েছে কিন্তু সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক নিঃসন্দেহে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন 'a romance of History.'

তথ্যসূত্র :

১. Alexander the Great---Jacob Abbott.

২. The Age of Imperial Unity--- Foreword by K.M. Munshi, R.C. Majumdar, A.D. Pusalker & A.K. Majumdar.

৩. Ancient India--- R.C. Majumder.

৪. Oxford History of India--- V.A. Smith.

৫. 'Alexander the Great : Monster of Macedonia'--- Richard Gabriel.

৬. 'Hellenistic India and The Mauryan Empire'— Dr. P. Prabhat.

৭. বাঙ্গলার ইতহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (অখণ্ড সংস্করণ)।

দিদির জমানো টাকায় প্রথম ফুটবল

নিলয় সামন্ত

এখন চতুর্দিক থেকে আসছে শুভেচ্ছা। কিন্তু এই শুভেচ্ছার বন্যায় ভেসে যায়নি প্রেমাংশু ঠাকুর। আইএফএ-র উদ্যোগে স্পেনের মন্ট্রিলে ফুটবল প্রশিক্ষণ নিতে যাচ্ছে প্রেমাংশু। সে নদীয়ার নাজিপুর বিদ্যাপীঠের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। সামনের সেপ্টেম্বরে আরও তিনজনের সঙ্গে স্পেনে যাবে সে।

কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আইএফএ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত ফুটবলারদের নাম ঘোষণা করেন। প্রেমাংশু ঠাকুরের সঙ্গে আর যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা হলেন মহেশ্বর সিংহ সর্দার স্ট্রাইকার পুরুলিয়া থেকে, দেবজিৎ রাউত গোলকিপার নদীয়া থেকে, অনিকেত মণ্ডল উইঙ্গার উত্তর ২৪ পরগনা থেকে, বিশাল সূত্রধর মিডফিল্ডার নদীয়া থেকে ও প্রেমাংশু ঠাকুর ডিফেন্ডার নদীয়া থেকে।

এদের মধ্যে প্রেমাংশু ঠাকুরের ডিফেন্স ভীষণ ভাবে নিশ্ছিদ্র। আর তার কথা আলাদা করে বলতে হয়, কারণ তার জীবন সংগ্রাম ভীষণ কঠিন। যে লড়াই অন্য কাউকে করতে হয়নি। দারিদ্র হয়তো অনেকেরই আছে, কিন্তু নিজের পরিবারের সঙ্গে লড়াই করে ফুটবল চালিয়ে যাওয়া ভীষণ কঠিন ব্যাপার। তার একমাত্র অভিভাবিকা হলেন তার মা দুর্গা সরকার। তাঁর লড়াইও ভীষণ কঠিন। তাঁর মধ্যে ছিল বুকে কষ্ট। ছেলে তার কথা শুনছে না। পড়াশোনায় ফাঁকি দিয়ে ফুটলবল পেটাচ্ছে। অভাবের সংসারে কী করে চলবে। পড়াশোনা না করলে কেমন করে সে সরকারি চাকরি জোটাবে। এই চিন্তায় বহু বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন দুর্গাদেবী। ছেলের সাফল্যের এই খবরে কষ্টের স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে মা দুর্গা সরকারের। একটা সময়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। নিজের বাবার কাছে ফিরে ছোট্ট ছেলেকে বুকে আগলে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তখন থেকেই দাঁতে দাঁত চেপে শুরু হয়েছিল ছেলের জন্য মায়ের লড়াই।

প্রেমাংশু ঠাকুর

ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করার জন্য অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ নিয়েছিলেন প্রেমাংশুর মা দুর্গা সরকার। পরিচারিকার কাজ করে ছেলের খাওয়া-দাওয়া ও পড়াশোনার খরচ সামলেছেন। তবে তাঁর মায়ের স্বপ্ন ছিল যে, ছেলে বড়ো হয়ে সরকারি চাকরি করে সংসারের হাল ধরবে। কিন্তু ছেলের ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা দেখে ভয় পেয়েছিলেন মা, কারণ তিনি আন্দাজ করেছিলেন যে, তিনি যে স্বপ্নটা দেখছেন সেটা হয়তো সফল হবে না। হাজার বকাবকি ও শাসনেও প্রেমাংশুর পা থেকে ফুটবল ছাড়াতে পারেননি মা। টিফিনের পয়সা জমিয়ে জুতো কিনে খেলা শুরু। দিদির জমানো টিউশনের টাকা চুরি করে প্রথম ফুটবল কেনা। স্কুল পালিয়ে ফুটবল প্র্যাকটিস।

ছেলের সাফল্যেও কষ্টের স্মৃতি ভুলতে পারেননি তিনি। ১৭ বছর বয়সে রানাঘাটের অসীম ঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। সুখের হয়নি সে পর্ব। মাত্র ২১ দিনের প্রেমাংশুকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁকে চলে আসতে হয়েছিল। বাবার বাড়িতে ফিরে ছোট্ট প্রেমাংশুকে বুকে আগলে লড়াই শুরু করেছিলেন তিনি।

স্পেনে প্রশিক্ষণ নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে খুশি প্রেমাংশু। দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়া বলেছে, 'আমার জন্মের পর মাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল বাবা। মা অনেক কষ্ট করে আমাকে বড়ো করেছে। এমন সাফল্য অর্জন করতে চাই, যাতে আমাদের ছেড়ে দেওয়া নিয়ে বাবাকে আফশোস করতে হয়। আমার অস্ত্র ফুটবল। ভালো খেলে দেশ ও রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করতে চাই।'

পশ্চিমবঙ্গের জেলা থেকে ফুটবল প্রতিভা তুলে আনার লক্ষ্যে আইএফএ এবং একটি বেসরকারি সংস্থা যৌথ ভাবে উদ্যোগী হয়েছিল। দুটি মডেল জেলা পুরুলিয়া ও নদীয়া থেকে দু'জন করে চারজন ফুটবল প্রতিভাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং হুগলি থেকে একজন করে সুযোগ পাচ্ছেন। মোট ছ'জন তরুণ প্রতিভাকে বাছাই করে পাঠানো হচ্ছে স্পেনে। এই বাছাই পর্বের দায়িত্বে ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার শঙ্কর লাল চক্রবর্তী।

ফুটবলের প্রতি প্রেমাংশুর ভালোবাসা যে কৃত্রিম ছিল না সেটা আজ বুঝতে পেরেছেন সকলে। সেই ফুটবলের মাধ্যমেই সাফল্যের পথ খুঁজে পেয়েছেন প্রেমাংশু। এবার প্রেমাংশু যাচ্ছেন বিদেশে। চোখের জল ধরে রাখতে পারছেন না মা দুর্গাদেবী। তিনি বললেন, 'নিজে না খেয়েও ছেলেকে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করেছিলাম। সারাদিন অন্যের বাড়ি কাজ করতাম, রাতে বিড়ি বাঁধতাম। কিন্তু ছেলের পড়াশোনায় একটুও মন ছিল না। সারাদিন ফুটবল নিয়ে পাগলামি করত। কষ্ট হতো, ভয়ও পেতাম। কী করে খাবে? কী হবে ওর ভবিষ্যত? আজ ওর সাফল্যে আমি শুধু গর্বিত।'

প্রেমাংশু ঠাকুর বললেন, 'আমার জন্মের পর মাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল বাবা। আমি এমন সাফল্য অর্জন করতে চাই যাতে আমাদের ছেড়ে দেওয়া নিয়ে বাবাকে আফশোস করতে হয়। এই প্রতিশোধের অস্ত্র একমাত্র ফুটবল। ভালো করে ফুটবল খেলে দেশ ও রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করতে চাই।' বর্তমানে প্রেমাংশুর পাসপোর্ট তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। জোরকদমে চলছে প্র্যাকটিস। আর কয়েক মাস পরেই পাড়ি জমাবেন স্পেনে। বল পায়েই দাগ কাটতে চান স্পেনীয় কোচদের মনে। বিশ্ব শিখরে তুলে ধরতে চান ভারতীয় ফুটবলকে।

কচ্ছে বেড়াতে গিয়ে প্রাচীন শিল্পকলার সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কচ্ছের রানের সীমান্ত ঘেঁষে দাগাড়া গ্রাম। গ্রামে পা রাখলে সকলেরই হাজারো রঙের ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। গ্রামের সর্বত্র মীর সম্প্রদায়ের মানুষজন পুঁতি দিয়ে হরেক রকমের জিনিস বানাচ্ছেন। এইসব জিনিস তৈরি হয়ে যাবার পর ভারতের বিভিন্ন মেট্রো শহরের দোকানে দোকানে শোভা পাবে। তারপর চলে যাবে ক্রেতাদের সুখী গৃহকোণে।

এতকাল এই অসাধারণ পুঁতির কাজ ও তার শিল্পীদের সুলুকসন্ধান গুজরাটের একাংশের মানুষই রাখতেন। গুজরাটের হস্তশিল্প নামক ট্যাগলাইনের নীচে ঢাকা পড়ে যেত মীর সম্প্রদায়ের শিল্পীদের নাম। বত্রিশ বছর বয়সি ইঞ্জিনিয়ার নিয়তি কুকাড়িয়া সেই খেদ দূর করেছেন। আমেদাবাদের নিয়তি কুকাড়িয়া পেশায় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত সংস্থা টোকার সাসটেইনেবল ডিজাইনসে তিনি মীর সম্প্রদায়ের মহিলাদের নিয়ে কাজ করেন। এই উদ্যোগ তিনি শুরু করেছিলেন ওই মহিলাদের একটা সম্মানজনক জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দেবার জন্য।

কিন্তু এত ভালো একটা কাজের প্রেরণা নিয়তি কোথা থেকে পেয়েছিলেন? একবার সোর এক্সকারসনস নামের এক সংস্থার কাজে নিয়তিকে কচ্ছের রানে যেতে হয়েছিল। অফিসের কাজের ফাঁকে তিনি স্থানীয় কারও মুখে মীর সম্প্রদায়ের কথা শোনেন। বিচিত্র তথ্যে ঠাসা নানান ঘটনা শুনে তিনি দাগাড়া গ্রামে যান। ওখানে গিয়ে পুঁতির কাজ দেখে তিনি অবাক হয়ে যান।

নিয়তি বলেন, '২০১৬ সালে দাগাড়া গ্রামে তৈরি দুটি কাজ আমার চোখে পড়ে। পুঁতির কাজ নিয়ে আমি যে একেবারে অজ্ঞ ছিলাম তা নয়। ছোটোবেলা থেকে গুজরাটের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পুঁতির কাজ আমি দেখে আসছি। আমার খুব ভালোও লাগে। কিন্তু এই দুটি কাজ ছিল আমার আগে দেখা সব কাজের থেকে আলাদা। প্রথম দিকে ভেবেছিলাম ওদের এই ঐতিহ্য সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরব। কিন্তু পরে বুঝেছি ওদের জীবিকার ব্যবস্থা করা সবচেয়ে আগে দরকার।'

মীর সম্প্রদায়ের এই পুঁতির কাজের উৎকর্ষ বজায় রাখার জন্য যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। চাইলেই বাইরে থেকে গিয়ে কেউ এই শিল্পকর্ম শিখতে পারেন না। মা মেয়েকে শেখান, মেয়ে আবার তার মেয়েকে। এই পরম্পরা চলতে থাকে। মেয়েরাই পুঁতির কাজ বেশি করে। পুরুষরা সাধারণভাবে মশলা চাষের সঙ্গে যুক্ত।

নিয়তির কাছ থেকেই মীর সম্প্রদায়ের প্রকৃত বাসভূমি এবং প্রাচীনত্বের কথা জানা গেল। এদের নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেবার পর নিয়তিকে স্বাভাবিক নিয়মেই নানা গবেষণা করতে হয়েছে। তাতেই জানা গেছে মীর সম্প্রদায় একদা যাযাবর মানবগোষ্ঠী ছিল। এদের প্রকৃত বাসভূমি মধ্য এশিয়ায়। বহু বছর আগে এরা ভারতবর্ষে চলে আসে। এখন ওরা গুজরাট, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা।

দেশের এক কোণে পড়ে থাকা মীর সম্প্রদায়ের পুঁতির কাজকে সারা বিশ্বের সামনে হাজির করে নিয়তি অসাধারণ কাজ করেছেন। সম্প্রদায়ের মহিলারাও কথাটা একবাক্যে স্বীকার করেন। সাকিনা মীর বলেন, 'যাযাবর সম্প্রদায় হওয়ায় আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। আমরা নিজেদের জন্য পুঁতির গয়না বানাতাম। এখন ১০টি বিভিন্ন দেশের টুরিস্ট আমাদের কাজ দেখতে আসেন। বিক্রিটিক্রি হয়। আমার মেয়েরা, পুত্রবধূ এবং আরও ২০ জন মহিলা এখন কাছাকাছি রিসর্টগুলিতে জিনিস বিক্রি করতে যাই। আগের থেকে আমরা অনেক ভালো আছি।' ▫

গাধার গান

এক ধোপার একটি গাধা ছিল। তার পিঠে কাপড়ের বোঝা চাপিয়ে ধোপা সারাদিন দূর দূর গ্রামে নিয়ে যেত। ধোপা যে ভাবে তাকে খাটাত, বেচারাকে সেভাবে খেতে দিত না। আধপেটা খেয়ে গাধা সবসময় মনমরা হয়ে থাকত।

এভাবে খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। রাতের বেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি চলে যেত চাষিদের খেতে। সেখানে কত শাকসবজি। পেট ভরে আনন্দ করে খেত সব। ভোর হতেই চলে আসত ধোপার বাড়ি। এবাবেই চলছিল। চুরি করে খেয়েদেয়ে তার চেহারাটা হয়ে যাচ্ছিল নাদুসনুদুস।

একরাতে তার শেয়ালের সঙ্গে দেখা। একটু কথা বলতেই শেয়ালের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেল। তারপর থেকে তারা দুজনেই চাষির খেত থেকে চুরি করে খেতে লাগল। গাধার চেহারা মোটাসোটা। সে আগে গিয়ে বেড়া ভেঙে খেতে ঢোকে। শেয়াল তার পিছু পিছু আসে। মনের সুখে খেতের ভালো ভালো ফলমূল খেয়ে যে যার জায়গায় চলে যায়।

একদিন হলো কী, সে রাতে খুব সুন্দর চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় চারদিক ফুটফুট করছে। এমন সময়ে প্রতিদিনের মতোই গাধা আর শেয়াল ঢুকল বেগুন চুরি করে খেতে। খেতে খেতে গাধার মনে পুলক জাগল। এত সুন্দর চাঁদের আলোয় গাধার যেন নেশা ধরে গেল। শেয়ালকে ডেকে বলল, বন্ধু আজ রাতটা বড়ো সুন্দর। আমার খুব গান গাইতে ইচ্ছা করছে। এখন একটু খাওয়া বন্ধ রাখ, তোমাকে একটা গান শোনাই। কোন রাগটা গাইবো বলো তো?

শেয়াল শুনে আঁতকে উঠল। বলল, বন্ধু রক্ষা করো। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল চাঁদের আলোয়? একে আমরা এসেছি চুরি করে খেতে। তার ওপর তোমার গলায় গান? কিছু মনে করো না বন্ধু, গলাটা তো তোমার মধুর নয়। তুমি গলা ছাড়লে খেতের পাহারাদারদের ঘুম ভেঙে যাবে আর রক্ষে থাকবে না। গানের কোনো দরকার নেই। পেট ভরে খেয়ে নাও। আহা, কী স্বাদ, যেন অমৃত!

শেয়ালের কথা শুনে গাধার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। রেগে গিয়ে বলল, জংলি তো, তাই গানের মর্ম কিছুই বোঝ না। এমন বেরসিক জানলে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বই করতাম না।

গাধা সবে গান ধরতে যাচ্ছিল। শেয়াল বলল, বন্ধু, একদম না। তোমার গলাটা কিন্তু একেবারে ভালো নয়। এসব বন্ধ করো, তাছাড়া বিপদে পড়বে। গাধা আরও খেপে গিয়ে পা ঠুকে বলল, কী বললি, আমার গলা ভালো নয়? আমি গান জানি না। শোন্ মূর্খ, সাত সুর, তিন গ্রাম, একুশ রকম মূর্ছনা আর ঊনপঞ্চাশ তাল— এই হলো গিয়ে সুর। এরপর আছে তিন মাত্রা, তিন লয়, ছত্রিশ রাগ, নয় রস, আর আটচল্লিশ রকম ভাব। এই সব কিছুই আমার মুখস্থ। শোন্ তাহলে—

শেয়াল তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, বন্ধু একটু সবুর করো। আমি আগে দেখে আসি পাহারাদার ঘুমিয়ে পড়েছে কি না। তারপর তুমি জমিয়ে একটা গান ধরো।

এই বলেই শেয়ার পগার পার। আর গাধা সেই জ্যোৎস্না রাত্রি কাঁপিয়ে আনন্দে গেয়ে উঠল— হ্যাঁক কো– হ্যাঁক কো।

খেতের পাশেই চাষিদের ঘর। সেই বিশ্রী শব্দে চাষিদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা লাঠিসোটা নিয়ে তেড়ে এল। এসে দেখে ফসলের দফারফা করে ছেড়েছে গাধাটা। দমাদম পিটুনিতে গাধার অবস্থা তখন কাহিল। সে আধমরা হয়ে মাটিতে পড়ে রইল।

খেতের পাশেই পড়ে ছিল একটা ভারী কাঠের ডান্ডা, সেটাকে গাধার গলায় কষে বেঁধে দিয়ে চাষিরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে গেল। খানিক পরে হুঁশ পিরে আসতেই গাধা দাঁড়িয়ে পড়ল। পিটুনির কথা ভুলেই গেছে। মনিবের হাতে পিটুনি খাওয়ার অভ্যাস তার আছে। সে গলাটা দুলিয়ে অনেক চেষ্টা করল ডান্ডাটা খুলে ফেলার, কিন্তু পারল না। তখন ডান্ডাটা নিয়েই পালানো চেষ্টা করতে লাগল।

শেয়াল ঝোপের আড়াল থেকে সব দেখছিল। এবার মুচকি হেসে বলল, বাঃ বাঃ বন্ধু, গান শুনে তোমার গলায় মেডেল ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে দেখছি। যাও, পুরস্কার পেয়েছো। এবার বাড়ি চলে যাও।

সংগৃহীত

বীর বনবাসী

রিনডো মাঝি

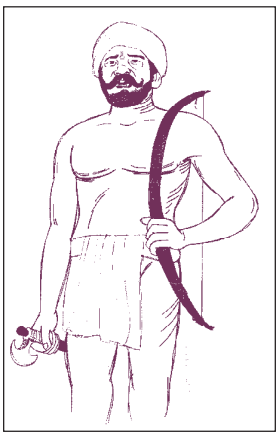

স্বাধীনতা সংগ্রামী জনজাতি যোদ্ধা রিনডো মাঝির জন্ম ওড়িশার কন্ধমাল জেলার কালাহান্ডিস্থিত উরলদানী গ্রামে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে কালাহান্ডি এলাকায় কন্ধা বিদ্রোহের নেতা ছিলেন তিনি। ব্রিটিশ সরকার বল প্রযোগ করে জনজাতি সমাজের মানুষদের জঙ্গল থেকে উচ্ছেদ করত। রিনডো মাঝির নেতৃত্বে জনজাতি সমাজের মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লড়াই শুরু করেন। জনজাতিদের মনে ভয় সৃষ্টির জন্য লেফটেন্যান্ট ম্যাকনিল রিনডো মাঝিকে বন্দি করে শিকলে বেঁধে গ্রামে গ্রামে ঘোরানোর পর ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ১০ ডিসেম্বর ফাঁসি দেয়।

জানো কি?

- খাবার ছাড়া মানুষ ২৮ দিন বাঁচতে পারলেও ঘুম ছাড়া ১১ দিনের বেশি বাঁচতে পারে না।
- পাকস্থলীতে তৈরি অ্যাসিড লোহা পর্যন্ত গলিয়ে দিতে পারে।
- ইংরেজি বর্ণমালার E সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বর্ণ আর Q সবচেয়ে কম ব্যবহৃত বর্ণ।
- স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে একমাত্র হাতি লাফ দিতে পারে না।

ইংরেজিতে Million লিখতে ৭টি অক্ষর লাগে, তেমনই ১ মিলিয়ন লিখতেও ৭টি সংখ্যা লাগে (১০০০০০০)।

ভালো কথা

পাখির বাসা

সেদিন বিকেলে হঠাৎ আকাশ কালো করে ঝড় ওঠে। সঙ্গে জোরে বৃষ্টি। একটু পরেই ঝড় বৃষ্টি থেমে যায়। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে দেখি গাছ থেকে অনেক পাখির বাসা মাটিতে পড়ে আছে। কোনো বাসায় ডিম আছে। কোনো বাসায় ছোটো ছোটো ছানা আছে। পাখিগুলো করুণস্বরে চিৎকার করছিল। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে পাঁচটি বাসা গাছের ডালে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিই। পরদিন সকালে দেখি পাখিগুলো নিজের নিজের বাসায় বসে আছে।

সুদর্শন রায়, নবম শ্রেণী, বেনাচিতি, দুর্গাপুর,পশ্চিম বর্ধমান।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

গাছ লাগাও

স্নিগ্ধা মাহাত, দ্বাদশ শ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

হচ্ছে ঝড়
ভাঙছে ঘর,
ফসল নষ্ট
মানুষের কষ্ট।
ঝড়ের সঙ্গে নাই বৃষ্টি
মা বলে এসব অনাসৃষ্টি
গাছপালা তো বেশি নাই
বৃষ্টির দেখা নাই তাই।
গাছ না থাকলে বৃষ্টি কমে
ধুলো বালি ফুসফুসে জমে
অসুখবিসুখ বাড়তে থাকে
অকালমৃত্যু এগিয়ে আসে।
এসব থেকে বাঁচতে হলে
গাছ লাগাও বেশি করে
সময়মতো আসবে বৃষ্টি
রক্ষা পাবে সকল সৃষ্টি।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

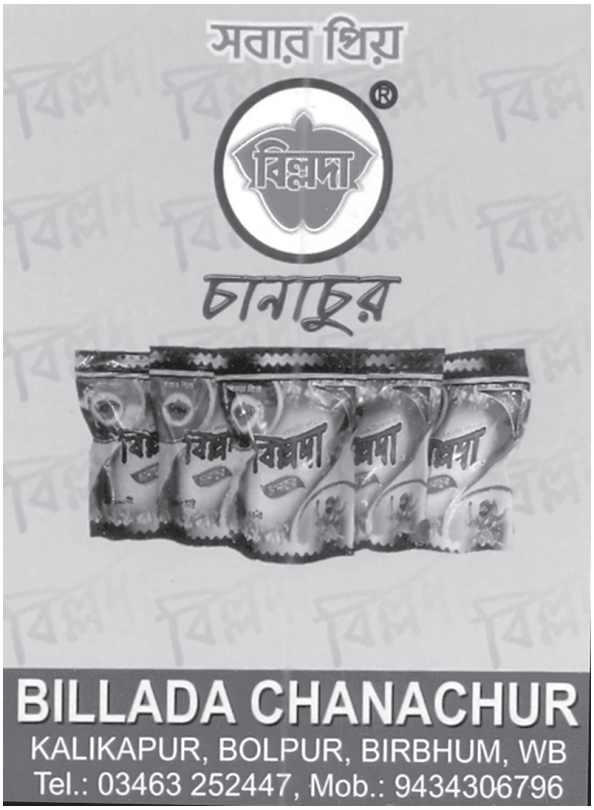

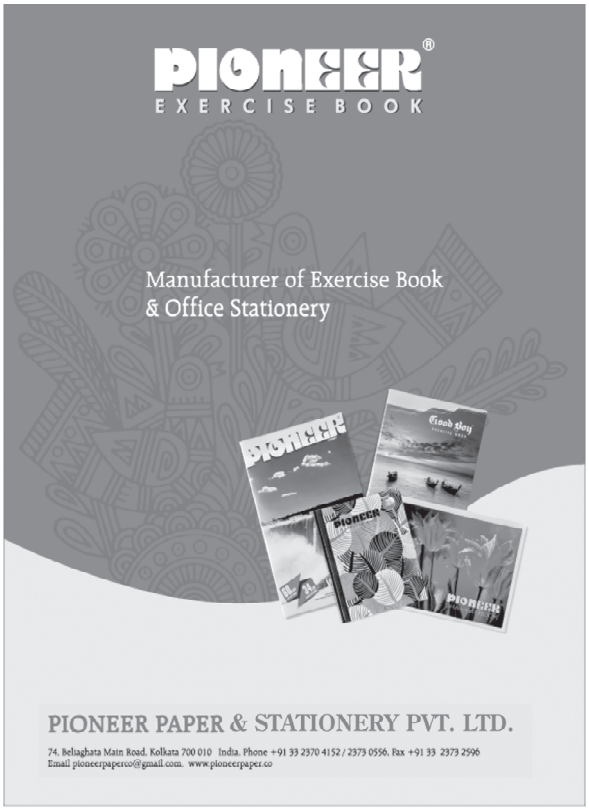

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

তদন্তে কীসের এতো ভয়? কী লুকোতে চাইছেন?

বিমল শঙ্কর নন্দ

সেটা ২০১২ সালের প্রথম দিকের কথা। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নাম ভাসিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে হয়তো অন্য কোনো নাম ভাবছিলেন। তা হলো প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের নাম। তার আগে ২০০২ থেকে ২০০৭ আবদুল কালাম ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। যাইহোক, শেষপর্যন্ত এপিজে আবদুল কালাম নির্বাচনে লড়াই করতে চাননি। আর মুলায়ম সিংহ যাদব মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আবদুল কালামকে সমর্থনের কথা বললেও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীকেই সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। পরে একবার এই প্রসঙ্গে না হলেও সাধারণভাবে তাঁর মনোবেদনা প্রকাশ করে মুলায়ম সিংহ যাদব বলেছিলেন 'কোনো কিছুর বিরোধিতা করলেই তো পিছনে সিবিআই লেলিয়ে দেওয়া হয়'। এর উত্তরে কংগ্রেসের এক মুখপাত্র বলেছিলেন 'আপনি যদি কোনো ভুল বা অন্যায় না করে থাকেন তাহলে সিবিআই-কে এতো ভয় কীসের?' মুলায়ম সিংহ বা আরও অনেক রাজনীতিবিদের ঘনঘন মন বদলানোর কারণ যাতে বুঝতে পারল মানুষ, ভারতীয় রাজনীতির কালো দিক হয়তো আরও কিছুটা উন্মোচিত হলো জনগণের সামনে।

সত্যিই তো, একেবারে আগুনখোর বিপ্লবী (মার্কসীয় অর্থে নয়) নেতা-নেত্রীরা তদন্তে এতো ভয় পান কেন? জনগণের সামনে কেউ বলেন, 'আমি খুবই সাধারণ, আমার পরিবার-পরিজন নেই। জনগণই আমার পরিবার', কেউ আবার প্রকাশ্য সভায় বলেন, 'দুর্নীতি প্রমাণ হলে আমি ফাঁসির দড়ি গলায় পরে মরতে রাজি।' জানি না স্বর্গে বসে ক্ষুদিরাম বসু এই কথাগুলো শুনতে শুনতে কী ভাবেন। কিন্তু সভায় বসে বা দূরদর্শনের পর্দায় বা ইউটিউব চ্যানেল দেখে কিংবা খবরের কাগজ পড়ে মানুষের একটা অংশ নিশ্চয়ই ভাবে যে দুর্নীতি প্রমাণ করতে তো তদন্তের প্রয়োজন। এদেশ কেন, পৃথিবীর কোনো দেশেই, সেখানে অন্তত নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা একটু হলেও টিকে আছে সেখানে বিনা তদন্তে কাউকে দোষী প্রমাণ করা যায় না, আর দোষী প্রমাণিত না হলে কাউকে শাস্তি দেওয়াও যায় না। তাই নিরপেক্ষ তদন্ত চাই। তদন্তে প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক কোনো স্তর থেকেই বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। তদন্তের ফলাফল বিচার বিভাগের কাছে পেশ করতে হবে। দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি দিতে পারে আদালত। আদালত যদি একশো শতাংশ নিশ্চিত হয় এক বা একাধিক ব্যক্তি দোষী, তবেই শাস্তি দেয়।

দুর্নীতিতে যাদের নাম ভেসে আসছে তদন্ত ঠেকাতে বা তদন্তের আওতার বাইরে নিজেদের রাখতে বিশলাখি-পঁচিশলাখি উকিলদের ধরে তারাও সব স্তরের আদালতের কাছে পৌঁছচ্ছে। এই তালিকায় বীরভূমের বীর থেকে এই রাজ্যের নতুন যুবরাজ সকলেই আছে।

কারণ বিচার প্রক্রিয়ায় যে নীতিটি বিশেষভাবে মেনে চলা হয় তাহলো একজন দোষী ব্যক্তির ছাড় পাওয়াকে মঞ্জুর করা যেতে পারে, কিন্তু একজন নির্দোষ ব্যক্তিও যেন সাজা না পায়। তদন্তের যে দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া তা কোনো স্তরে বাধা পেলেই তদন্ত শেষ করতে সমস্যা হবে। একজন পুলিশ অফিসারকে তদন্তের প্রয়োজনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় এবং শাসক রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যদি ধরনায় বসে পড়েন তবে সুষ্ঠু

ফঃ ৬

তদন্ত কিছুতেই সম্ভব নয়। যে সিবিআই অফিসাররা কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বা তদন্তের জন্য অন্যান্য রাজ্যে যান তাঁরা যদি স্থানীয় পুলিশের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত কিংবা নিগৃহীত হন তাহলেও সুষ্ঠু তদন্ত কিছুতেই সম্ভব নয়। তদন্ত আটকানোর আগে একটা উপায় এদেশে খুবই প্রচলিত। বিশলাখি, পঁচিশলাখি উকিল ধরো, উচ্চআদালতে যাও, আইনের ফাঁকফোকর খুঁজে তদন্তের হাত থেকে কিংবা শাস্তির হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করো। তাতেও যে সবসময় সুবিধা মেনে হয়তো নয়। বিহার, হরিয়ানা কিংবা তামিলনাড়ুতে বেশ 'ওজনদার' রাজনৈতিক নেতারাও এই ধরনের সব চেষ্টা করে, শেষে বিফল হয়ে জেলের ঘানি টানতে হয়েছে। তবু অপরাধীরা বিশেষত প্রভাবশালী অপরাধীরা এই ধরনের চেষ্টা করে, করতেই থাকে, কারণ সকলেই বাঁচতে চায়।

তাই সে একই প্রশ্ন বার বার ফিরে ফিরে আসে, তদন্তে এতো ভয় কেন? কেনই-বা তদন্ত আটকানোর এমন প্রাণান্তকর চেষ্টা? সেই চেষ্টা কেবল কোনো ব্যক্তির তরফে নয়, সরকারের তরফেও বার বার দেখা যাচ্ছে। সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, নারদ স্টিং অপারেশন কেলেঙ্কারি, শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতি, পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি প্রভৃতিতে সিবিআই তদন্ত আটকাতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার করদাতাদের টাকা খরচ করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ, তারপর সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত গেছে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে তদন্ত আটকাতে। কিন্তু খরচ হয়ে গেছে কোটি কোটি টাকা। আজ অবধি ঠিক কত টাকা রাজ্য সরকার সিবিআই বা ইডি-র তদন্ত আটকাতে খরচ করেছে তার সঠিক কোনো হিসাব সরকারের তরফে দেওয়া হয়নি। কিন্তু যারা আইন আদালতের খবর রাখেন তারা বলেন পরিমাণটা বেশ কয়েকশো কোটি টাকা। প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা ঋণগ্রস্ত রাজ্যে কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত আটকাতে এতো অর্থ খরচ কেন? তদন্তে এতো ভয় কেন? প্রশ্ন তো উঠবেই।

এর পাশাপাশি এইসব কেলেঙ্কারি বা অন্যান্য দুর্নীতিতে যাদের নাম ভেসে আসছে তদন্ত ঠেকাতে বা তদন্তের আওতার বাইরে

ছোটোবেলা থেকে একটা কথা শুনে আসতাম— 'স্নেহ অতি বিষম বস্তু।' এখন দেখছি ভয়ও এক অতি বিষম বস্তু।

নিজেদের রাখতে বিশলাখি-পঁচিশলাখি উকিলদের ধরে তারাও সব স্তরের আদালতের কাছে পৌঁছচ্ছে। এই তালিকায় বীরভূমের বীর থেকে এই রাজ্যের নতুন যুবরাজ সকলেই আছে। সরকার কত খরচ করেছে তা আগামীদিনে তদন্ত করলে নিশ্চয়ই জানা যাবে। কারণ এগুলো রাজকোষের টাকা, তার প্রতিটি টাকা খরচের জন্য শাসককে জবাবদিহি করতে হয়। সে আজ কিংবা কাল। কিন্তু কোনো ব্যক্তি সাধারণত তার ব্যক্তিগত খরচের জন্য অপরের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি 'পাবলিক ফিগার' কিংবা জনপ্রতিনিধি হন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগবেই, যে মামলার জন্য এতো টাকা খরচ করে তার টাকার উৎস কী? তদন্ত আটকানোর এমন মরিয়া চেষ্টা কেন? তদন্তে এতো ভয় কেন?

এর উত্তর আছে, পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের চরিত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। রাজনৈতিক দলকে একটা ভাবমূর্তি তৈরি করতে হয় জনগণের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিপিএম-কে ক্ষমতাচ্যুত করতে একটা ভাবমূর্তি তৈরি করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস যখন তারা সিপিএম-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতো। সেটা হলো তাদের সর্বোচ্চ নেত্রীর সততার ভাবমূর্তি, এক হার না নানা আন্দোলনকারীর ভাবমূর্তি। তার সঙ্গে ছিল গণতন্ত্রের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার প্রতিশ্রুতি। এক স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি। তার বদলে গত ১১ বছরে পশ্চিমবঙ্গ উপহার পেয়েছে স্বাধীনোত্তর যুগের সম্ভবত বৃহত্তম দুর্নীতি— শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি এবং আরও বেশ কিছু বহু আলোচিত দুর্নীতি। এর একটাও যদি তদন্তে চূড়ান্তভাবে সত্যি প্রমাণিত হয় এবং বড়োসড়ো মাথাগুলো দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেলে ঢোকে ওই ভাবমূর্তি ধ্বংস হয়ে যাবে।

এতোদিন দলে দলে নেতার জেলযাত্রাকে এই দল ব্যাখ্যা করেছে ব্যক্তিগতস্তরে দুর্নীতি বলে। দলকে এর থেকে দূরে রাখার (ব্যর্থ) চেষ্টা করে চলেছে। চূড়ান্ত রায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কিছু নেতা জেলে গেলে সেকথা বলারও আর জায়গা থাকবে না। দ্বিতীয়ত, দল এতো দুর্নীতির অভিযোগ সত্ত্বেও যাদের নাম বা নেতৃত্বকে আঁকড়ে ধরে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে, তাদের চারদিকে তদন্তের বৃত্ত যদি ক্রমেই ছোটো হতে থাকে তাহলে সমূহ সর্বনাশ, দলে নেতৃত্বের সংকট অনিবার্য। তৃতীয়ত, দুর্নীতির অভিযোগে জেরবার দল একটা পন্থাকেই আঁকড়ে ধরেছে। সেটি হলো সন্ত্রাসের সাহায্যে মানুষের মধ্যে ভয় ধরিয়ে জেতার চেষ্টা করা। আর মানুষকে অর্থ দিয়ে অথবা বিনে পয়সায় সুবিধা পাইয়ে দিয়ে এক নির্ভরশীল সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করা। যারা অন্ধের মতো দলকে ভোট দেবে।

কিন্তু দুর্নীতির তদন্ত যদি তার যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছায় তবে এর কিছুই কাজ দেবে না। সন্ত্রাসের ভয়ে কুঁকড়ে থাকা বহু মানুষ ভয় কাটিয়ে মুখ খুলবে। প্রশ্ন করবে, 'রাজা তোর কাপড় কোথায়'? সেই লক্ষণগুলো ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের আলোচনায় এখন এক মুখরোচক বিষয় হলো পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের দুর্নীতি। যারা একটু বেশি সাহসী তারা প্রকাশ্যে চোর বলে গালি দেয়। এই একটি দুটি কণ্ঠ একদিন শত সহস্র কণ্ঠে পরিণত হবে। রাজনৈতিক দলটা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। রাজনীতির ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয়। তাই চারিদিকে এ রাজ্যের শাসকদলের মধ্যে এতো ভয়। যে কোনো মূল্যে তদন্ত ঠেকানোর এতো চেষ্টা। ছোটোবেলা থেকে একটা কথা শুনে আসতাম— 'স্নেহ অতি বিষম বস্তু।' এখন দেখছি ভয়ও এক অতি বিষম বস্তু। □

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি এবং বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

ড. সুমন চন্দ্র দাস

গত ১৯ সেপ্টেম্বর এবিপি আনন্দ সংবাদমাধ্যম নিউজ চ্যানেলে বিশেষ সাক্ষাৎকার দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। আর যা নিয়ে প্রবল বিতর্ক সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে হয়। পরবর্তীতে মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট থেকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার দুটি মামলা তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়ার আদেশ আসে। তাই বিচারপতির বিশেষ বক্তব্য এবং সাক্ষাৎকারের কথা তুলে ধরে কিছু দুর্নীতির বিষয় সম্পর্কে বিচারপতির বক্তব্যর অভিমুখ কেমন ছিল, তা দেখার চেষ্টা করব। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি এবং বিচারপতি হিসেবে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবিপি আনন্দকে বিশেষ সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেন, আমি যে কথা বলছি তা হলো বিচারপতিরা নিজেদের বাক্‌স্বাধীনতার নিরিখে বলতে পারেন। তিনি বলেন, 'ব্যাঙ্গালোর প্রোটোকলের ভিত্তিতে আমার এই বক্তব্য অত্যন্ত সুরক্ষিত। এট নিয়ে বিতর্ক হতে পারে কিন্তু একজন বিচারপতি হিসেবে আমার বিশেষ বাক্‌স্বাধীনতা রয়েছে।' এসএসসিতে অনেকে জালিয়াতি করে ঢুকেছে। যারা চাকরি পেয়েছে অধিকাংশ দুর্নীতি হয়েছে। তবে দুর্নীতি করে যারা ঢুকেছে তাঁদের ধরতে পারলেই চাকরি যাবে।' অভিজিৎবাবু বলেন, 'আমি তো জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দুর্নীতি দেখে আসছি। আমিও বেকার ছিলাম, বেকারের যন্ত্রণা আমি জানি। চোখের জলে বেকারের বালিশ ভেজে কীভাবে আমি দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর গোলমাল হয়েছে শিক্ষক নিয়োগে। কমিশনের চেয়ারম্যান বলছেন, আমরা নিয়োগপত্র দিইনি। উলটোদিকে অ্যাডহক কমিটির প্রেসিডেন্ট কল্যাণময় গাঙ্গুলি যা বলছেন, দুটোর মধ্যে নিয়োগের বিষয়ে কোনো কিছুর মিল নেই। দুর্নীতি স্পষ্ট হয়েছে। তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত করা একান্ত প্রয়োজন।'

সাক্ষাৎকারে অভিজিৎবাবু জানান, সিবিআই খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। অনেক দেরি হয়েছে কিন্তু অভিজিৎবাবু নিজে এই দেরির বিষয় নিয়ে ততটা ধৈর্যশীল নন। তাঁর মন্তব্যে উঠে আসে সিবিআই অনেকটা চাপে পড়েছিল। বিচারপতির সিবিআইয়ের আচরণে ও তদন্তের গতি দেখে মনে হচ্ছিল যে, আশার আলো নেই। এই ব্যাপারে হাইকোর্টে মামলার প্রসঙ্গে তিনি সিবিআই ডেপুটি ডিরেক্টর উপেন বিশ্বাসের উপদেশ ও পরামর্শ এই দুর্নীতির তদন্তে বিশেষ সিট গঠনের ধারণা পান। এবং এই সিটের অফিসারদের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তদন্তভার থেকে কোনো অফিসারকে সরাতে পারবে না কেউ। তদন্ত সিটে সরাসরি কোর্টের নজরদারি রাখতে পারবেন বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি। যদিও বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের দুজন অফিসারের নাম নিয়ে আপত্তি ছিল। তবুও এই সিটেই তদন্ত চলছে বলা যায়। শান্তিপ্রসাদের থেকে কেন সিবিআই কথা বের করতে পারল না, এই প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। সিবিআই আদালত সিবিআই অফিসারদের এমন মন্তব্য করেন। ইডি যা করতে পেরেছে সিবিআই তা করতে পারেনি কেন? এই প্রশ্ন সকলের মনেই। পশ্চিমবঙ্গে মুড়িমুড়কির মতো দুর্নীতি হয়েছে বলে বিচারপতি বলেন। স্কুলের করণীয় যে দায়িত্ব, তার থেকে স্কুলের শিক্ষকের সেই সামাজিক দায়িত্ব অনেক বেশি। শিক্ষকরা সমাজের মেরুদণ্ড। রাজ্য সরকার বলেছে কোনো শিক্ষকের চাকরি যাবে না কিন্তু বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন দুর্নীতিতে যুক্ত সকলের চাকরি বাতিল হবে।

বিচারপতি বলেন, পুলিশের উপর ভরসা আছে কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন পুলিশ। আর তাই ১০ মাসে ১০টা সিবিআই কেসের আদেশ এই জন্যই হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগে যে দুর্নীতি হয়েছে তা কল্পনার বাইরে। যারা জালিয়াতি করেছে তাঁদের সকলের চাকরি যাবে। সমাজ তৈরির কারিগর হলেন শিক্ষকরা। যারা জালিয়াতি করে নিয়োগ পেয়েছেন তাঁরা কী শিক্ষা দেবেন, এই প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এরা শিক্ষক সুলভ আচরণ করবেন না বরং টুকতে সাহায্য করবেন। আরও বলেন, যারা দুর্নীতি করেছেন তাঁরা যেন নিশ্চিত থাকেন যে তাঁদের চাকরি যাবে। তদন্তের জন্য সিবিআইকে বিশেষভাবে সিটের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

অভিজিৎবাবু বলেন, একজন বিচারপতি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন এটা অনেকেই ভালো ভাবে নিচ্ছেন না কিন্তু বিচারপতি নিজে ব্যাঙ্গালোর প্রোটোকল মেনে বিচারপতির বাক্‌স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করেছেন। বিচারকদের এক্তিয়ার বুঝেই মন্তব্য করবেন। কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে গালাগাল দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। বিচার ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস রেখেই মন্তব্য করছি। তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেন, নিজেকে কোনো ভাবেই প্রোজেক্ট করতে চাই না। এই বিষয়ও বলেন যে শিক্ষামূলক বিষয় ছাড়া মামলা করতেন না তিনি। আরও বলেন, শক্ত হাতে দুর্নীতিকে দমন করতাম।

অভিজিৎবাবু শান্তি প্রসাদ সিনহার সম্পত্তির হিসাবের এফিডেফিট দিয়ে চেয়েছিলেন। হিসাব দিলে যদি হিসাবের বাইরে সম্পত্তির খোঁজ

মেলে তাহলে তা বাজেয়াপ্ত হবে। এই মামলা ডিভিশন বেঞ্চ যায় কিন্তু বেঞ্চ বলে আমরা হস্তক্ষেপ করব না। কিন্তু বেঞ্চ বলে মুখ বন্ধ খামে সম্পত্তির হিসেব দেওয়া হবে আর রায়দানের দিন তা প্রকাশ করা হবে।

দুর্নীতি আটকাতে গেলে বারবার ছাড় দেওয়া চলে না। আমি যে কোনো দুর্নীতির কেসে এভিডেন্স অ্যাক্ট ব্যবহার করি। এভিডেন্স অ্যাক্টে ১৬৫ নম্বর ধারা ব্যবহার করে থাকি। তিনি বলেন আমার এই অধিকার বলে কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। প্রয়োজনে আমি কলার ধরে হাজির করতেও পারি। দুর্নীতির মামলা আমার কাছে থাকলে এমন ঘটনাই ঘটবেই। যদি সুপ্রিমকোর্ট আমায় বহিষ্কার করে তবুও বলব আমি যা করেছি নৈতিক জায়গা থেকে দুর্নীতির বিষয়ে ঠিক কাজ করেছি। দুর্নীতি আমাদের ভারতবর্ষকে শেষ করে দিয়েছে। কবি জীবনানন্দ জীবদ্দশায় স্বীকৃতি পাননি, আমিও আমার জীবন দিয়ে যা করছি তা যেন কোনো একসময় গবেষণার বিষয় হয় তা আমি চাই। গবেষকরা মূল্যায়ন করবেন যথাসময়ে। বিচারপতি হিসেবে সৎভাবে কাজ করার চেষ্টা করছি। তবে সমাজে টিকে থাকতে গেলে দুর্নীতির সঙ্গে আপোশ করতে হয়। আমি এতদিন আপোশ করিনি যখন আর শেষ সময়েও করব না। আমার জীবনের ৫০ বছর পার করে ফেলেছি। এতদিন করিনি যখন আর করব না। আমার আর অতো টাকাপয়সার দরকার নেই। মানুষের জন্য কাজ করতে গেলে সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা ভাবতে হয়। সামাজিক ন্যায়বিচারে আবেগ নয়, যা ঘটেছে সেই কথাই মনে রাখতে হয়।

ক্যানসার আক্রান্ত রোগী সোমা দাস স্কুলে চাকরি করছেন। অবসর গ্রহণের পর কাউকে খুশি করতে কোনো কমিশন, ট্রাইবুন্যালে বসতে চাই না আর সেই ইচ্ছাও নেই আমার। রাজনীতির কথা বললেও হয় তো দলীয় রাজনীতি নাও করতে পারি। তবে সামাজিক আন্দোলন করব। প্রয়োজনে ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করব।

শিক্ষা আধিকারিকদের মধ্যে একটা ভয় তৈরি হওয়া দরকার ছিল। সত্য কথা বলতে বিচারব্যবস্থা যদি কড়া হয় তাহলে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকের অবস্থা খুব খারাপ হবে। আদালত থেকে সাংবাদিকদের বের করে দিতে হবে বলে অনেক চাপ আসে কিন্তু করিনি। আদালতের সত্যতা সামনে আসা খুব দরকার ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, 'আপনি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। আপনি আমাদের বিরুদ্ধে কেন!'

অভিজিৎবাবু বলেন, আমি মামলা সম্পর্কে সম্পর্কিত বিষয়েই মন্তব্য করি। মানুষের জন্য ভাবি। আমি তো মানুষ হয়েছি কলেজ স্ট্রিটে। অনেকে আছেন হয়তো সমাজে প্রতিষ্ঠিত হননি, কিন্তু অনেক জ্ঞানী ছিলেন এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। জীবনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা খুব বড়ো কিছু নয়। মগজ থেকে কাগজে নিয়ে আসা সহজ কিন্তু কাগজ থেকে কাগজে লেখা খুব কঠিন। আমি নিজে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছি। ল্যান্ড রেভিউনিউ অফিসে চাকরি করেছি কিন্তু দুর্নীতি করব না বলে ছেড়ে দিয়েছি। একজন সরকারি আমলা হয়ে পঞ্চায়েত সদস্য বা প্রধানের কাছে কোনো সম্মান পাইনি। তাই নিজের বিবেকের কাছে ছোটো হবো না বলে চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

আইনজীবীরা চাইলেই সত্য কথা বলতে পারেন। দেশের জাতীয় জরুরি অবস্থার সময় আইনজীবীরা বিশেষ আন্দোলন করেন। শিক্ষা দপ্তরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনজীবীদের আন্দোলন করা দরকার। দেশের কোনো সরকারি আধিকারিকের দেশের মানুষের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করার নৈতিক অধিকার নেই। অভিযোগ জমা পড়লে ঠিক বিচার হলে চাকরি চলে যেতে পারে। ভারতীয়দের এমন অভদ্র আচরণ কাম্য নয়। পুলিশ আগে বাড়িতে এলে ভয় পেতাম, এখন না আসলে বরং ভয় পাই। আদালতে দুই রকমের মানুষ আসেন, এক ধরনের মানুষ ন্যায়বিচার চাইতে আসেন। অপর শ্রেণীর মানুষ বিচারে কোর্টের কাছে রক্ষা কবচ চায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষরা খুব ক্রুর ও বদমাশ। বিচার ব্যবস্থার সংস্কার দরকার। পরিকাঠামোর উন্নতি দরকার। যত মানুষ বিচার চায় আর যত মানুষ বিচার দেন এর মধ্যে বৈষম্য দূর করা একান্ত প্রয়োজন। বিচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধি দরকার। আমি নিজে দক্ষ কী না জানি না তবে আমি সৎ, এ কথা বলতে পারি।

দলীয় রাজনীতি না করে মতাদর্শের রাজনীতি করতে পারি। দলত্যাগ বিষয়ে স্পিকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক নেতাদের বিচারকদের নাম নিয়ে সমালোচনাকে অত্যন্ত খারাপ চোখে দেখি আমি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আমার নামে সমালোচনা করেন তখন আমি লাদাখে, শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হই, যেহেতু এর সঙ্গে আমি যুক্ত তাই ভেবেছিলাম একটা রুলবুক ইস্যু করে ওকে ডাকব। আমি আমার মতো করে আইনের মধ্যে কাজ করতাম। যেহেতু একটা এই মন্তব্যের বিষয়ে মামলা হয়েছে তাই আর দরকার নেই। তবে আবার শুনলে কড়া ব্যবস্থা নেব। আইনের কঠোর প্রয়োগ হলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিচার ব্যবস্থা এবং বিচাকদের প্রতি এমন আচরণ অত্যন্ত অন্যায়। বিচার ব্যবস্থার উপর যারা প্রশ্ন তোলেন, কটাক্ষ করেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। দুর্নীতি হলো একটা way of life। কারণের কথাকে বারবার তুলে ধরতে হবে। আমি জানি আমার বিরুদ্ধে যে কোনো সময় আদেশ আসতে পারে। আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমি মাথা পেতে নেব। আমি মনে করি স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে যা নির্মাণ হওয়ার কথা ছিল তা ঠিক ঠিক সময়ে সেই স্তরে পৌঁছায়নি। তাই আমাদের সেই পথ কী তার সন্ধান করতে হবে।

২৯.০৪.২০২৩ তারিখে সুপ্রিমকোর্টের প্রাইমারি মামলায় প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় দুটো মামলা থেকে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেন। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, আজ আমার মৃত্যু দিন। সুপ্রিমকোর্ট যুগযুগ জিও। আমি যে কাজটা ছয় মাসে করতাম তা এখন ষাট বছর লাগবে। আমি এটাও জানি আগামীদিনে সব মামলা সরানো হবে। দুর্নীতির আরও যে সব মামলা আছে তা আজ যে গ্রাউন্ডে সরিয়ে নেওয়া হলো তাও সরিয়ে নেওয়া হবে। চ্যানেলে যে ইন্টারভিউ দিয়েছি তা নিয়ে কী বলেছে সেই বিষয়ে স্পষ্টতা নেই। যারা আজ মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশে আশাহত হয়েছেন তাঁদের আশাহত হওয়ার কিছু নেই। অন্য বিচারপতিরা মামলা দেখবেন। ধৈর্য ধরে বসে থাকুন। এইভাবে বসে রাখলে মৃত্যু হলেও কিছু করার নেই। আমি নিজে পদত্যাগ করছি না। সর্বোচ্চ আদালতের কথা মান্যতা দিতে হবে। যেদিন আমি বিচারকের আসনে থাকবো না, সেই দিন বাইরে থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করব। পালিয়ে যাব না।

বিচারপতির এই সাক্ষাৎকার বর্তমান সময়ের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক। সরকার যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, প্রশাসন যখন দলদাস হয় আর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা যদি নির্বাক থাকেন সেই সময় বিচার বিভাগের ভূমিকা সমাজের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গের জন্য বর্তমান সময় এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি একটি কলঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। □

‘দ্য কেরালা স্টোরি’ শুধু কেরালার নয়, সারা বিশ্বের গল্প

সুবল সরদার

‘দ্য কেরালা স্টোরি’র পটভূমি— কেন্দ্রীয় চরিত্রে এক মেয়ে। তার গান ছিল। হাসি ছিল। স্বপ্ন ছিল। প্রেম ছিল, জীবন যেমন হয় আর কী। কিন্তু এখানে প্রেম ছিল না, প্রেমের ফাঁদ ছিল। তাদের পরিচয় কলেজে নার্সিং পড়ার সময়। হোস্টেলে তার দুই সঙ্গীর সঙ্গে থাকত আইএসআইএসের এক ছদ্মবেশী ছাত্রী। সে ছিল আইএসআইএসের এক সক্রিয় সদস্যা। শুরু হয় মগজ ধোলাই। কলেজ পড়ুয়া ওই ছাত্রী অজ্ঞাত এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। প্রেগন্যান্ট হয়। তারপর যা হবার তাই হয়। বিয়ের শর্তে তাকে মুসলমান হতে হয়। এখানে কিন্তু শেষ নয়। বিয়ে করে ওই যুবক নিরুদ্দেশ হয়। তারপর ওই মেয়ে শালিনী (নাম পরিবর্তন করে হয় ফতেমা) এবং তার দুই সঙ্গী-সহ সিরিয়ায় পাঠানো হয় জেহাদিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। ভাবা যায়, তারা হবে ভারত বিরোধী জেহাদি! বর্তমানে তার স্থান সিরিয়ার জেলে। একজন মৃত। আর একজন বারে বারে ধর্ষিতা হয়ে কোথায় আছে কেউ জানে না। সত্য কাহিনি অবলম্বনে এমন ছবি দেখে সন্ত্রসাবাদীদের ভয় লাগার কথা, কিন্তু ভয় লাগছে বর্তমান সরকারের, গদি হারানোর ভয়ে যদি ‘দুধেল গাইয়েরা’ তাঁকে ভোট দানে বিরত থাকে। সিনেমায় দেখতে পেলাম না সন্ত্রাসবাদী আইএসআইএসের ওই চর ছাত্রী শাস্তি পেয়েছে কিনা যে এই কঠোর কুনাট্যের কারণ হয়ে ওঠে।

কেরালা হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করার পর কিছু দৃশ্য বাদ দেওয়া হয় এবং হাইকোর্টের মন্তব্য ছিল সেন্সর বোর্ড যখন পাশ করেছে তখন হাইকোর্ট আর হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু হাইকোর্টের উপরে আছেন এক সর্বেসর্বা আইন না মানা, বেপরোয়া, গণতন্ত্রের পক্ষে এক বিপজ্জনক নেত্রী। তাই সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। তিনি ভোট ছাড়া কিছু বোঝেন না বা জানতে চান না। তিনি ওই সিনেমার ট্রেলর দেখে রাজনৈতিক ট্রেলর ভেবে প্রহর গুনতে শুরু করেন। ফলে সারা দেশে এই মুভি মুক্তি পেল, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে নিষিদ্ধ হলো। সিনেমা হলে ঢুকে পুলিশের ধরপাকড়, দর্শকদের সঙ্গে গণ্ডগোল শুরু হয়। দ্য কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে গণ্ডগোল হয়নি। এখানেও কোনো গণ্ডগোল থাকার কথা নয়। কিন্তু শিয়রে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তাই তাঁকে ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ ব্যান করতেই হয়।

সন্ত্রাসবাদীদের মতো তাঁর আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ আজ ক্ষমতা আছে মানে আগামীকাল ক্ষমতা থাকবে এমন নয়, আমাদের গণতন্ত্র সেই কথা বলে। তার মানে এই নয় যে ওই মুভি প্রধানমন্ত্রীর ভালো লেগেছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর খারাপ লাগবে। আমাদের গণতন্ত্র এ কথাও বলে না। সিনেমা আর গণতন্ত্র এক না করাই ভালো। ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ তারপর ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ এরপর হয়তো আসতে পারে সঞ্জয় মিশ্রের ‘দ্য বেঙ্গল ডায়েরি’। সিনেমা তৈরি হয় তো সিনেমার জন্যে, চিত্ত বিনোদনের জন্যে, বিনোদন জগতের যা কাজ। নেতা-নেত্রীদের মাথাব্যথার কারণ কী? অভিজ্ঞতা বলছে, ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে আজ পর্যন্ত যে বইগুলো নিষিদ্ধ হয়েছিল সেগুলো ক্রমশ মুক্তি পেয়ে আসছে। সেই বইগুলো দেখে দেখে বা পড়ে পড়ে শুদ্ধ হচ্ছে আজ।

এই মুভি নারীর অধিকার, সুরক্ষার জন্যে ব্যাপক প্রচারের দরকার আছে। সিনেমাটি সেই উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে। এখানে ইসলাম বিরোধী কোনো সংলাপ নেই। সব মুসলমান যদি খারাপ হতো, সারা পৃথিবী কখন ধ্বংস হয়ে যেত। কিছুলোক ধর্মীয় উন্মাদনায় মত্ত হয়ে নিরীহ অমুসলমানদের ধর্মান্তরিত করে সংখ্যা বাড়াতে চায়। তারা জানে সংখ্যা বাড়লে সব কিছু অনায়াসে জয় করা যাবে। তারা মনে করে পৃথিবীর সব অধিকার শুধু তাদেরই আছে। অন্যদিকে আর একদল উগ্রপন্থী আছে তাদের কল্পনা কবিদের কল্পনা থেকে সুদূরপ্রসারী। নিরীহ অমুসলমান মহিলাদের বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করলে নাকি তাদের বেহেস্তে স্থান হয়, সাক্ষাৎ আল্লাহর সঙ্গে দেখা হয়। এমন সুযোগ কে ছাড়ে? তাই তারা সুন্দর পৃথিবীকে নরক করে কল্পনায় স্বর্গ রচনা করে সুখ খুঁজে বেড়ায়। কেরালা স্টোরি মুক্তি পায় তর্ক বিতর্ককে সঙ্গী করে। একদল বলেছে এটা সকলের জানা দরকার। এটা কেবল বিনোদন। বাঙ্গালি পরিচালক সুদীপ্ত সেন তীব্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এই ব্যানের বিরুদ্ধে। ফিল্ম স্টার শাবানা আজমি থেকে নির্বাসিতা লেখিকা তসলিমা, অভিনেত্রী কঙ্কনা রানাওয়াত সবাই শিল্প, বাক্‌স্বাধীনতার পক্ষে মুখ খুলেছেন। আর একদল বলেছেন বিদ্বেষমূলক, মুসলমান বিরোধী ইত্যাদি।

বিরোধীরা বলে থাকেন গুজরাট থেকে নাকি প্রতি বছর কয়েক হাজার নারী নিখোঁজ হয়। ধীরে ধীরে প্রকাশ হচ্ছে প্রতিটি রাজ্য থেকে হাজার হাজার নারী এভাবে উধাও হয়। মানব পাচারকারীদের সফট টার্গেট হচ্ছে নারী, শিশুদের বিক্রি করা। এটা যেমন ভয়ংকর সন্ত্রাস। তেমনি পৃথিবীর বুকে মহাভয়ংকর কাজ হলো ধর্মান্তরিত করা এবং তাদের জেহাদি তৈরি করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো। এখানে দুটোর মধ্যে পার্থক্য করে সুস্পষ্ট বোঝা দরকার। ২০২১ সালের এনসিআরবি রিপোর্ট বলছে, ভারতে প্রতি ঘণ্টায় ৪৮টা মেয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, তার মধ্যে অনেকে লাভ জিহাদের শিকার। এটা একটা পরিকল্পিত সন্ত্রাস। পারবে রাজ্যগুলো শ্বেত পত্র প্রকাশ করতে? সে সাহস আছে? মানবতাই ধর্ম, মানবতা বিরোধী কখনোই নয় যেখানে এতো ধর্মান্ধতা, এতো নিষ্ঠুরতা। এখন সময় এসেছে ধর্মীয় উন্মাদনার বিরুদ্ধে ধর্মীয় সচেতনার। ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা, এদের সুমতি দিন। সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, জল, বাতাস যদি সবার হয়, ঈশ্বর গড়, আল্লাহও সবার। তাহলে এতো ধর্মীয় উন্মাদনা কেন, এ বিভাজন-বা কেন? □

ইয়াসিন মালিকের ফাঁসি চায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের ইয়াসিন মালিকের ফাঁসির আবেদন নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। শীঘ্রই পিটিশনের শুনানি হবার কথা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এনআইএ-র বিশেষ আদালতের বিচারে এর আগে ইয়াসিন মালিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের অর্থ জোগানোর অভিযোগ ছিল। ইউএপিএ এবং আইপিসি-র বিভিন্ন ধারায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আদালতে তার শাস্তি হয়।

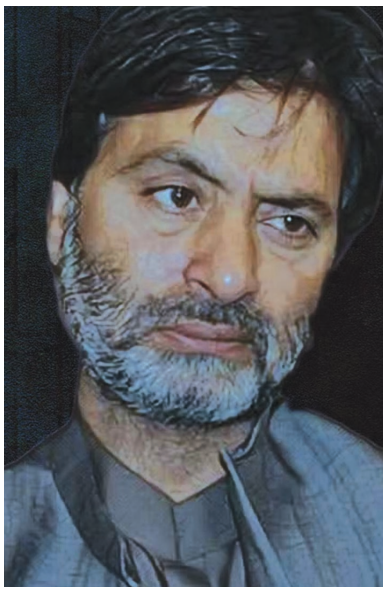

এনআইএ তাদের আবেদনে জানিয়েছে ইয়াসিন মালিক কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাদের এই 'অ্যাক্ট অব ওয়ার'-এর জন্যই দেশের বহু সেনা মারা গেছে। এর ফলে শুধু তাদের পরিবারবর্গই দুঃখ পায়নি, সারা দেশ কষ্ট পেয়েছে। এনআইএ তাদের আবেদনে জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কয়েক দশক ধরে বিদেশি সন্ত্রাসবাদী সংস্থার সহায়তায় কাশ্মীরে একের পর এক হামলা চালিয়েছে। এই অবস্থায় অভিযুক্তকে যদি ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট (মৃত্যুদণ্ড) না দেওয়া হয় শুধুমাত্র এই কারণে যে অভিযুক্ত তার দোষ স্বীকার করেছে, তাহলে তা ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এবং অনেক সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়ার পর দোষ স্বীকার করে মৃত্যুদণ্ড এড়িয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২৫ মে ২০২৩, ট্রায়াল কোর্টের বিচারক ইয়াসিন মালিকের মামলায় রায় ঘোষণার সময় বলেছিলেন, আমার মতে এই ব্যক্তির আচরণে কোনোরকম অনুতাপ, অনুশোচনা দেখা যাচ্ছে না। এটা ঠিক যে, এই ব্যক্তি ১৯৯৪ সালে অস্ত্রত্যাগ করেছেন কিন্তু তার আগে তিনি যে সব নৃশংস কাজকর্ম করেছেন তারজন্য তাকে ক্ষমা চাইতে আমরা কেউ দেখিনি।

কর্ণাটকে হিন্দু ফোবিয়া ক্রমশ বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কর্ণাটকে হিন্দু ফোবিয়ার এক ঘটনায় ইসলামিক মিলিট্যান্ট গ্রুপের সদস্যরা এক হিন্দুর ওপর অত্যাচার চালালো। ওই ব্যক্তির অপরাধ তিনি তাঁর মুসলমান বান্ধবীর সঙ্গে স্ন্যাক্স শেয়ার করে খাচ্ছিলেন। ঘটনাটি কর্ণাটকের চিক্কাবালপুর জেলার। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ভিডিয়ো ভাইরাল হবার পর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ছেলে-মেয়ে দুটি যখন হোটেলে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন তখনই দুষ্কৃতীরা তাদের সন্ধান পায় এবং হামলা চালায়। দুষ্কৃতীরা যখন জানতে পারে হিজাব পরিহিত মুসলমান মেয়েটির সঙ্গী একজন হিন্দু তখন তাঁকে জনসমক্ষে হেনস্তা করা শুরু হয়। বন্ধুর বিপদ দেখে মেয়েটি এগিয়ে আসে, দুষ্কৃতীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ারও চেষ্টা করে কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

মেয়েটি শেষ পর্যন্ত পুলিশের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানান। পুলিশ সেইমতো এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। যদিও এখন পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি।

সম্প্রতি ইসলামিক দুষ্কৃতীদের হিন্দু-মুসলমান ছেলে-মেয়েদের ওপর নানা অত্যাচারের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল বেশ কিছু ভিডিয়োর মাধ্যমে জানা গেছে, মুসলমান দুষ্কৃতীরা কাল্পনিক 'ভগবা লাভ ট্র্যাপের' মোকাবিলায় হিন্দু ও মুসলমান তরুণ-তরুণীদের হেনস্থা করছে, তাদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করছে এবং শারীরিকভাবে তাদের নিগ্রহ করছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভগবা লাভ ট্র্যাপের ধুয়ো প্রথম তুলেছিলেন সাজাদ নোমানি, ২০২১ সালে।

‘ভারত-চীন সম্পর্ক এক জটিল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি : এস জয়শঙ্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, যে ভারত-চীন বৈদেশিক সম্পর্ক বর্তমানে এক জটিল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ভারত-চীন সীমান্তের স্থিতাবস্থার এক তরফা পরিবর্তনের সবরকমের প্রয়াস রোধ করতে নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার সবরকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। গত ২৭ মে বিদেশমন্ত্রী বলেন যে সম্প্রতি গত ৩ বছর ধরে ভারত-চীন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এই চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে দুই দেশেরই দায়িত্ব এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা, কিন্তু এই ক্ষেত্রে এক হাতে তালি বাজবে না।

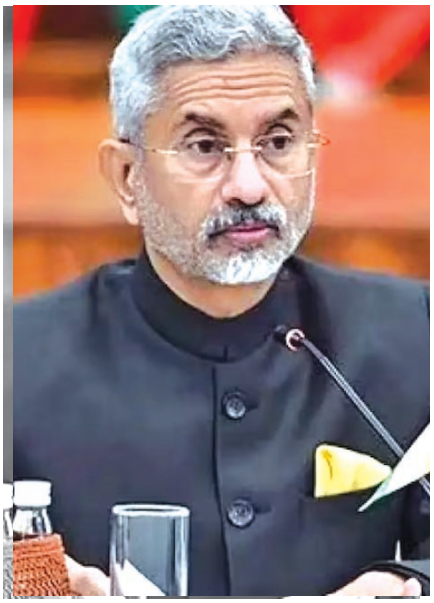

অনন্ত ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আয়োজিত ‘মোদীজীর ভারত : এক উদীয়মান শক্তি’ শীর্ষক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী মন্তব্য করেন, দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও প্রভাবিত হয়। পূর্ব লাদাখে চীনা অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ করে বিদেশমন্ত্রী জানান যে বড়োমাপের শক্তিসম্পন্ন দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত অবশ্যই বর্তমানে চীনের পক্ষ থেকে এক অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। চ্যালেঞ্জটি বেশ সমস্যাজনক এবং বিগত ৩ বছর যাবৎ চীন-ভারত সীমানায় এই সমস্যাটি ক্রমশই একটি জটিল আকার ধারণ করেছে। তিনি বলেন, এই ক্ষেত্রে ভারত সরকার প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এবং ভারত-চীন সীমান্তের স্থিতাবস্থার একতরফা পরিবর্তন রোধে যাবতীয় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা ক্রমে তাঁর ব্যাখ্যা হলো যে এহেন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে দুটি দেশকেই ভারসাম্য ও সমাধানের রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে এবং অতীতের সরকারগুলি তাদের মতো করে সাম্যাবস্থা রক্ষার সেই প্রয়াস চালিয়ে গেছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কেবল একতরফা ভাবে সেই স্থিতাবস্থায় উপনীত হওয়া অসম্ভব। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা ভারসাম্যহীনতার শামিল। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত পারস্পরিক সম্মান, সংবেদনশীলতা ও দ্বিপাক্ষিক জাতীয় স্বার্থ।

তিনি প্রশ্ন তোলেন যে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মান না থাকলে বা জাতীয় স্বার্থের মতো বিষয়ে অপর পক্ষের সংবেদনশীলতার অভাব থাকলে একত্রে পথচলা সম্ভব কী না। এবং ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে এর উত্তরে বলেন যে, প্রাপ্য সম্মান, মর্যাদা, সংবেদনশীলতা ও স্বীকৃতি লাভ করলে ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে চীনের সঙ্গে এক উন্নত সম্পর্কের আশা রাখে। জয়শঙ্কর জানান যে, কোয়াড গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি সম্প্রতি সামুদ্রিক সহযোগিতা, পরিকাঠামোগত সংযোগ, ফাইভ জি প্রযুক্তি, ভ্যাকসিন এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেছে। পশ্চিমের অন্যান্য দেশ যথা— ইজরায়েল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ইত্যাদি দেশের সঙ্গেও ভারত আলোচনা চালাচ্ছে বলে তিনি জানান।

কর্ণাটকে জয়ের পেছনে রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কর্ণাটকে সদ্যগঠিত কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে, জনতা দল (সেক্যুলার) নেতা ও পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী গত ২৯ মে, এক প্রেস কনফারেন্সে দাবি করেন, কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস অর্থের বিনিময়ে ভোটারদের ভোট কিনেছে। ভোটারদের প্রলুব্ধ করার জন্য কংগ্রেস বিশেষ কার্ড বিতরণ করে বলে তিনি দাবি করেন।

কুমারস্বামীর অভিযোগ এই শতাব্দী প্রাচীন দলটি ৩৫০০-৫০০০ টাকা ব্যালেন্সসম্পন্ন বিভিন্ন শপিংমলে ব্যবহারযোগ্য কার্ড নির্বাচনের আগে ভোটারদের মধ্যে বিলি করে। কর্ণাটকের ৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রের গ্রামীণ জনতার মধ্যে এইরকম ৬০,০০০ কার্ড বিলি করা হয়েছে বলে তিনি জানান। কংগ্রেস ও জেডিএস দলের মধ্যে সাম্প্রতিক বাক্‌যুদ্ধের মধ্যে কুমারস্বামীর এই সাংবাদিক সম্মেলন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগ নতুন নয়। এর আগেও রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি ডিকে শিবকুমারকে একটি র‍্যালিতে টাকা ছুঁড়তে দেখা যায়। বেভিনাহাল্লীতে একটি শোভাযাত্রার ভিডিয়োতে শিবকুমারকে জনতার উদ্দেশে টাকার বান্ডিল ছুঁড়তে দেখা যায়। এই ঘটনার পরে কর্ণাটক কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি শিবকুমারের বিরুদ্ধে স্থানীয় পুলিশ নির্বাচনী প্রচারে নগদ অর্থ ব্যবহারের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করে। ওই জেলায় নির্বাচনী প্রচারে নগদ অর্থ বিলির অভিযোগে পুলিশ শিবকুমারের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য ধারায় অভিযোগটি দায়ের করেছিলেন।

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৪৭।।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো। কিন্তু ভেঙে গেল দু'ভাগ হয়ে। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান। পূর্ব বাঙ্গলার তখন ভয়াবহ অবস্থা। দলে দলে গৃহহীন মানুষ চলে আসছে এপার বাঙ্গলায়। নিঃস্ব সর্বহারা দুর্গতদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন মহানামব্রতজী। সাহায্য করতে লাগলেন তাদের মনোবল ফেরাতে।

তাঁর ভাষণ শোনার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। তাঁর যুক্তি দিয়ে বোঝানোর ক্ষমতায় মানুষ হারিয়ে যাওয়া মনের জোর ফিরে পেত। মহানামব্রতজী বলেছিলেন, সনাতন ধর্মকে শিক্ষা থেকে আলাদা করে দিলে সে শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব দিতে পারে না।

(ক্রমশ)